দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ • ৬ ষ্ঠ সংখ্যা • ১৭ জুন ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ বিজেপি ২
- 'জনরায়'এর মহিমায় ভারতে বিরোধী দলের পুনর্জন্ম ৪
- ভারতের নির্বাচন সমাপ্ত হল ৬
- উত্তর প্রদেশে বিজেপির বিপর্যয় ৭
- দেশে পরাজিত মোদি, বঙ্গে বামপন্থীরাও ৮
- নিট ইউজি বিতর্ক ২০২৪ ১০
- মুখের কথা যখন ইতিহাসের আকর ১৩
- ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ১৬
- মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ঃ দুই গালে চার থাপ্পড় ১৭
- বাংলায় শাসক সফল, বিরোধীরা ব্যর্থ ১৯
- সাজানো এক্সিট পোল শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি –এই হচ্ছে মোদীতন্ত্র ২১
- মানবাধিকার কর্মী গৌতম নাওলাখার মুক্তি ২২
- অনুচিৎ গাঙ্গুলির আত্মকথন ২৪
- বাংলার লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের গতিপ্রকৃতি ২৭

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

সংবিধানকে রক্ষা করাই এখন প্রধান কর্তব্য

অবশেষে মন্দির – মসজিদ, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি পরাস্ত হয়েছে ।জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করেছেন মোদীর ' আবকি বার ৪০০ পার 'এই শ্লোগান। ৩৭০ তো দূরঅস্ত, তিনশ' পর্যন্ত পেরতে পারেনি বিজেপি। এমনকি ২৭২–ও নয়। বিজেপি এককভাবে পায়নি গরিষ্ঠতা। পাঁচবছর আগের তুলনায় ৬৩টি আসন কম পেয়ে থেমে গিয়েছে ২৪০–এ। আসন সংখ্যা কমেছে ২১ শতাংশ। ২০১৪ এবং ২০১৯। পরপর দু'বার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর এবার হারিয়েছে গরিষ্ঠতা। এটিই সবচেয়ে বড় ধাক্কা। এনডিএ জিতেছে ২৯৩ আসনে। ইন্ডিয়া মঞ্চ ২৩৪ আসনে। দুই–তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা (৩৬২) থেকে বহু দূরে এনডিএ। দশবছর পর, আবকি বার মোদীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য নয়। আবকি বার জোট সরকার। নীতিশ কুমার আর চন্দ্রবাবু নাইডুর সমর্থনে। এখন কিছুদিন অন্তত মোদী সরকার বলা বন্ধ হবে। বলা হবে ' এন ডি এ সরকার।'

তবে নরেন্দ্র মোদীর চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে ভাবার কোনও কারণ নেই। তার মন্ত্রিসভার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। গোটা মন্ত্রিসভায় একজনও ইসলাম ধর্মের মানুষ নেই। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ যারা, তাঁদের কোনও প্রতিনিধি নেই। নেই খ্রীষ্ট ধর্মের কোনও মানুষ। নির্বাচনী প্রচারের সময় মোদী যে নিম্নস্তরের ভাষা প্রয়োগ করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের আক্রমণ করেছেন, তাকি প্রধান মন্ত্রীর ভাষা? অনবরত মিথ্যা ভাষণ করে বলে গিয়েছেন, কংগ্রেস দল তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছে তারা হিন্দু মহিলাদের স্বর্ণালঙ্কার ও মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দেবে। গরু বাছুর কেড়ে নিয়ে দিয়ে দেবে মুসলমানদের। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করার পরও নির্বাচন কমিশন ছিল নিশ্চুপ। কিন্তু জাগ্রত জনগণ অযোধ্যা, চিত্রকুট প্রভৃতি রামায়ণের স্মৃতি বিজড়িত প্রতিটি স্থানে মোদী মনোনীত ধর্ম ব্যবসায়ীদের পরাস্ত করেছে।

দেশের মানুষ সহ বিরোধীদের এখন প্রধান কর্তব্য সংসদীয় গনতন্ত্রের রীতিনীতিকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করা। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প, ব্যাংক, বীমা, রেল, বন্দর আদানি আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়া বন্ধ করা।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ বিজেপি

সৌর বসু

এবারের লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছিল ১৯ এপ্রিল এবং শেষ পর্বে ভোট পড়ল ১ জুন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ৭ দফায় ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হল। ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা গেল বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। বিগত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল মোট ৩০৩ টি আসন। এবারের নির্বাচনের সেই আসন ২৪০ টি তে নেমে গেছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার স্লোগান তুলেছিলেন 'আবকি বার চারশ পার।' ৪০০ তো অনেক দূরের কথা, বিজেপির আসন এবার ২৪০ টিতেই আটকে গেল।। অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোট পেয়েছে ২৩৪ টি আসন। কংগ্রেস একক দল হিসেবে ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে পেয়েছিল ৫২ টি আসন এ বছর তা বেড়ে ৯৯ টি আসন হয়েছে। ২ জন নির্দল সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তাদের এম.পি সংখ্যা আপাতত ১০১।এবারের নির্বাচন বিভিন্ন কারণে ঐতিহাসিক। প্রথমত নরেন্দ্র মোদী এবার ধর্মীয় বিদ্বেষকে হাতিয়ার করে নির্বাচন লড়েছিলেন। উন্নয়নমূলক কোনও প্রকল্পের কথা তিনি প্রাক নির্বাচনী বক্তৃতায় উল্লেখ করেননি। প্রত্যেকটি বক্তৃতা ছিল ধর্মীয় বিষোদগারে পরিপূর্ণ। এমনকি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার সম্পর্কে অপব্যাখ্যা ও চরম মিথ্যা প্রচার করে তিনি বলেছিলেন যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের কাছ থেকে মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেবে, জনগণের জমি, সম্পত্তি, গরু , মহিষ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন দেশের সম্পদের উপর মুসলমানদের প্রথম দাবি। নরেন্দ্র মোদীর এই সব বক্তব্য ছিল সর্বৈব মিথ্যা। কংগ্রেসের ইশতাহারে আর্থিক বৈষম্যের উল্লেখ ছিল, কিন্তু জমি কেড়ে নেওয়ার কথা কোথাও বলা হয়নি।

২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন কায়েম করেছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল লোকসভাতে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্য। নরেন্দ্র মোদী যতদিন গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীকে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া আর কোনও দলের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। গুজরাটের দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীর মুসলিম বিরোধী ভূমিকা তাকে হিন্দুর হৃদয় সম্রাট আখ্যানে ভূষিত করেছিল।। এরপর থেকে নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাট শাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে ও তাকে অবজ্ঞা করার মতো কোনো নেতা তখন ছিল না। যদিও অটল বিহারী বাজপেয়ী গুজরাট দাঙ্গার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীকে রাজ ধর্ম পালনের কথা বলেছিলেন।। কিন্তু আদবানি নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।।নরেন্দ্র মোদীর গায়ে আঁচড় পড়েনি। গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিই ছিলেন প্রশাসনের সর্বময় কর্তা। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন।

তার প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম পাঁচ বছরে তিনি নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়িত করতে তিনি ব্যর্থ হন। প্রথমত বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে তিনি ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যাংক একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি নোট বন্দি ঘোষণা করেন। তার প্রত্যেকটি ঘোষণাই চমকপ্রদ এবং সেখানে প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এই নোট বন্দির ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখোমুখি হয়। নোট বন্দির মূল উদ্দেশ্য কালো টাকা কে উদ্ধার করা, সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।

২০১৭ সালের ৩০শে জুন মধ্যরাতে সংসদের সেন্ট্রাল হলে তিনি পন্য ও পরিষেবা কর ঘোষণা করেন। তার প্রত্যেকটি এই ধরনের পদক্ষেপের মধ্যেই একটি গিমিক আছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন শুধু প্রধানমন্ত্রী নন অত্যন্ত সফল ইভেন্ট ম্যানেজারও বটে। এই নতুন পণ্য ও পরিষেবা করের মাধ্যমে তিনি দেশের সমস্ত করকে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। কিন্তু অত্যন্ত তড়িঘড়ি এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করার ফলে নানাবিধ ত্রুটি দেখা যায়। যার ফল সাধারণ মানুষকে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অসীম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

২০১৯ সালে ক্ষমতায় এসে নরেন্দ্র মোদী ধর্মীয় মেরুকরণের উপর জোর দেন। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ প্রত্যাহার করে জম্মু ও কাশ্মীরে দুটি ইউনিয়ন টেরিটেরি গঠন করা হয়।শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ না থাকায় এবং নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠার কারণে, ভারতীয় সংবিধানকে অগ্রাহ্য করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের সময়

ও সংবিধানকে উপেক্ষা করে, রাষ্ট্রপতি পদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে নরেন্দ্র মোদী সংসদ ভবনের দ্বার উদঘাটন করেন। এই অনুষ্ঠানেও নরেন্দ্র মোদী ব্যতীত অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। রাম মন্দির উদ্বোধনের ক্ষেত্রে দেখা গেল সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সংশোধন করে নরেন্দ্র মোদীর সর্বময় কর্তৃত্ব।

২০০২ সাল থেকে ২০১৪ সাল অবধি নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এবং ২০১৪ সাল থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শাসন কার্য পরিচালনা কালীন, কোন শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন বলে জানা যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সোপান বেয়ে তিনি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন, কর্তৃত্ববাদী মোদীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বাঁধনও আলগা হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি শপথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন তিনি আর সর্বময় কর্তা নন, শাসনকার্য চালাবার জন্য তাকে অন্যান্য শরিক দলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।নরেন্দ্র মোদীর যে চরিত্র আমরা এতদিন অবধি দেখে এসেছি সেখানে নমনীয়তার কোন নজির অনুপস্থিত। নরেন্দ্র মোদীকে এবার সরকার চালাতে হবে শরিক দলের সঙ্গে সমঝোতা করে। এবারের এন.ডি.এ জোট সরকারের বড় শরিক দল তেলেগু দেশম এবং জনতা দল ইউনাইটেড। তেলেগু দেশমের প্রধান মুখ চন্দ্রবাবু নাইডু ইতিপূর্বে কয়েকবারই এনডিএ র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, পুনরায় এন.ডি.এতে ফিরে এসেছেন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে চন্দ্রবাবু নাইডু অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার কারণে এন.ডি.এ জোট ত্যাগ করেন। অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি পকেটে সংখ্যালঘুদের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি রয়েছে। চন্দ্রবাবু নাইডু সংখ্যালঘুদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণের পক্ষপাতি। নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপির সংখ্যালঘু বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত।এবারের নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তৃতায় বহিরাগত বা অনুপ্রবেশকারী, সন্তান উৎপাদনের মেশিন প্রভৃতি মিথ্যা অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিষোদগার করেছেন। জনতা দল ইউনাইটেড নেতা নিতীশ কুমার জাতিভিত্তিক জনগণনা (caste census) এবং বিহারের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজের কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি এক দেশ এক জাতি এক নির্বাচনে বিশ্বাসী। বর্ণভিত্তিক জনগণনার পরিপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি। এনডিএ জোটে যোগ দেবার পরেও জনতা দল ইউনাইটেডের নেতা নীতিশ কুমার বর্ণ ভিত্তিক জনগণনার দাবি তুলেছেন। নিতিশ কুমার ইতিপূর্বে বহুবার এন.ডি.এ জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন, পুনরায় জোটের হাত ধরেছেন। এ বছরই লোকসভা নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া জোটের শরিক ছিলেন নিতিশ কুমার। এই আয়ারাম গয়ারামদের নিয়েই জোট সরকার পরিচালনা করতে হবে নরেন্দ্র মোদীকে। সেখানেই প্রশ্ন উঠেছে নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসন চালাবার ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্রী মনোভাব নিয়ে। নরেন্দ্র মোদীর জীবনীকার নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক করণ থাপারের সঙ্গে কথোপকথনের সময় এই প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য নরেন্দ্র মোদীকে এবার অনেক বেশি বেশি করে ক্যাবিনেট মিটিং করতে হবে। সেখানে শরিকদলের দাবি দাওয়ার কথা আলোচনা করতে হবে। এতদিন অবধি তিনি শুধু নির্দেশ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখন থেকে তাকে শরিক দলের কথা শুনতে হবে। ইতিপূর্বে তাকে কোনদিন এই কাজ করতে হয়নি। নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য নরেন্দ্র মোদী পরাজয় স্বীকার করতে জানেন না। সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার স্বৈরাচারী মনোভাবের সঙ্গে সকলে পরিচিত। নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মতে নরেন্দ্র মোদী এবারের লোকসভা নির্বাচনে ৩৭০ টি আসনে বিজেপি জয়ী হবে বলে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা গেল মাত্র ২৪০টি আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। এটা বস্তুতপক্ষে বিজেপির নৈতিক পরাজয়, রাজনৈতিক পরাজয়। নরেন্দ্র মোদীর কাছেও এটা বিশাল একটা পরাজয় বলে নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মনে করেন। যদিও মোদীজি সর্বসম্মুখে এই পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ।সেজন্যে নতুন সরকার গঠনের পর তাঁর বক্তৃতায় বিজয়ের উল্লাস শোনা গিয়েছে। কিন্তু জোট সরকার পরিচালনা করতে গেলে তাকে অনেক বেশি নমনীয় হতে হবে। তাহলে কি আমরা এখন নতুন মোদীকে দেখতে পাব। একনায়কতান্ত্রিক মোদীর সামনে এখন নমনীয় মোদী সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

‘জনরায়’এর মহিমায় ভারতে বিরোধী দলের পুনর্জন্ম

মাহফুজ আনাম

(ভারতের নির্বাচন এবং সরকারের গতি প্রকৃতি বাংলাদেশের মানুষের কাছে সবসময়েই গুরুত্বপূর্ণ, তাই অসীম আগ্রহের বিষয়। নিবন্ধটি লিখেছেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক ‘দ্য ডেইলি স্টার’-এর সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম)

ভারতের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর প্রথম নেতা হিসেবে টানা তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নরেন্দ্র মোদি। ভারতের জনগণ তাদের নেতা ও পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের বেছে নিয়েছেন। সেজন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের দৃশ্যপটে ফিরে এসেছে জোট সরকার। বিজেপির একদলীয় আধিপত্যে ২০১৪ সালে এই ধারার অবসান ঘটেছিল। এবারের নির্বাচনে এককভাবে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ২৭২টি আসন পায়নি দলটি। ফলে তাদেরকে সরকার গঠনের জন্য জোটের অংশীদার বিহারের নীতীশ কুমার ও অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী এবং এই উপমহাদেশের জোট নির্ভর রাজনীতিতে অতি প্রত্যাশিতভাবেই নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডু ইতোমধ্যেই তাদের সমর্থনের বিনিময়ে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন। কারণ, তাদের সমর্থন ছাড়া নতুন সরকার গঠন করতে পারবেন না মোদি।

কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ একাধিক মন্ত্রণালয়সহ স্পিকার পদের দাবি নিয়ে দরকষাকষি করছে তেলেগু দেশম পার্টি।

এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর মোদির জৌলুস বড় আকারে কমেছে এবং বিপরীতে বিরোধীদল উজ্জীবিত হয়েছে। দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্তর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের মাঝে একটি বার্তা ঘুরছে, যেখানে লেখা রয়েছে; ‘ভারতীয় ভোটাররা এমন এক রায় দিয়েছেন, যা দীর্ঘদিন মনে রাখতে হবে। তারা বিজেপি ও তার মিত্রদের এমন এক জয় দিয়েছেন, যা পরাজয়ের মতো। তারা ইন্ডিয়া জোটকে এমন এক পরাজয় দিয়েছেন, যা জয়ের মতো।’

সার্বিকভাবে মোদির জয় খুবই চিত্তাকর্ষক। বিজেপি একাই ২৪০টি আসন জিতে নিয়েছে, যা বিরোধী দলগুলোর সমন্বিত আসনের চেয়েও বেশি এবং এককভাবে কংগ্রেসের জয়ী হওয়া ৯৯ আসনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

এই পরিসংখ্যান দেখার পর প্রশ্ন আসতেই পারে যে তাহলে কেন বিজেপির জয়কে পরাজয়ের মতো লাগছে? কারণ, তারা তাদের সম্ভাব্য সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছে এবং ৫৪২ আসনের লোকসভায় ৪০০টিরও বেশি আসনে জিতবে বলে যে স্লোগান দিয়েছিল, তাতে মিশে ছিল ঔদ্ধত্য ও অতি আত্মবিশ্বাসের নিদর্শন। প্রকারান্তরে তাদের এই সাফল্যকে পরাজয়ের মতো করে দেখাচ্ছে। সব মিলিয়ে এটা ছিল তাদের নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো কাজ।

যখন বিশ্বের অসংখ্য দেশে গণতন্ত্রের ক্ষয় হচ্ছে এবং তাদের নির্বাচনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের উদ্যোগে, তেমন একটি সময়ে এসেও ভারতের নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্যতা এমন একটি অর্জন, যা প্রশংসার দাবিদার এবং সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে উদযাপনের উপলক্ষ।

এই নির্বাচনে দেশটির ১৪০ কোটি নাগরিকের মধ্যে ৯৬ কোটি ৮০ লাখ ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত ছিলেন, যা মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৬৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ এবারের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, যাদের মধ্যে ৩১ কোটি ২০ লাখ ছিলেন নারী। এটি মানব ইতিহাসে যেকোনো নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের রেকর্ড।

বিজয়ী হলেও ক্ষমতাসীন জোট এনডিএ নির্বাচনে জোর ধাক্কা খেয়েছে বললেও কম হবে এবং বিষয়টি ভারতের ভেতরে ও বাইরের সব নির্বাচন পর্যবেক্ষককেই বিস্মিত করেছে। নরেন্দ্র মোদি ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এবং বিজেপি একক দল হিসেবে তাদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে পারলেও বিরোধীদলের পুনর্জাগরণ; বিশেষত সেই পুরোনো ও প্রাচীন

দল কংগ্রেসের, যাদেরকে অনেক বিশেষজ্ঞ বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছিলেন; একটি কার্যকর গণতন্ত্রের জেগে ওঠার নিদর্শন, যা ভারত ও তার প্রতিবেশীদের জন্য কেবল সুফলই বয়ে আনতে পারে।

আমাদের বিবেচনায় সদ্য সমাপ্ত ভারতীয় নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিরোধীদলের পুনর্জন্ম। বস্তুত, একে পার্লামেন্টের 'পুনর্জন্ম'ও বলা যায়। কারণ, পার্লামেন্টটি একদলীয় আধিপত্যে হিমশিম খাচ্ছিল এবং যথাযথ বিরোধিতার অভাবে কার্যকারিতা হারাচ্ছিল। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট সব ধরনের জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এখানেই সব ধরনের জাতীয় ইস্যু নিয়ে বিতর্ক হয়, সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়, পুলিশের কাজের বিচার হয় এবং সম্পদ বণ্টনের পূর্ণাঙ্গ যাচাই-বাছাই হয়। যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, পার্লামেন্টে সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে জনগণই তাদের 'মালিক'।

বিজেপির আধিপত্যের কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেন্টের এই কেন্দ্রীয় ভূমিকার ক্ষয় ভারতেও দৃশ্যমান হচ্ছিল; যা আমরা বাংলাদেশে দেখেছি। ভারতের নির্বাচনে ২৩৩ আসন পাওয়ার পর সুশাসন কাঠামোর ওপর বিরোধীদল কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে বলেই প্রত্যাশা। এর গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সরকার ও সরকারের কার্যক্রমকে আরও বড় আকারে জবাবদিহির আওতায় আনা যাবে। নতুন যেকোনো আইন আরও বেশি নজরদারিতে থাকবে এবং সব বড় প্রকল্প ও ব্যয়বহুল কার্যক্রম আরও গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করা হবে।

পার্লামেন্টে শক্তিশালী বিরোধীদল থাকলে প্রত্যেক আইনপ্রণেতাই নিজেকে আরও বেশি ক্ষমতাবান মনে করেন। যার প্রভাবে তারা সরকার ও সার্বিকভাবে প্রশাসনের কার্যক্রমে প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারেন;বিশেষত আমলাদের প্রতি, যাদের জনগণের সেবা করার মানসিকতা নেই বললেই চলে।

সরকারের ওপর নজরদারি ও তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে বিরোধীদলের কার্যকরী ভূমিকা ফিরিয়ে আনা আমাদের জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ, আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি যে পার্লামেন্ট হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংসদে একটি দলের সর্বময় উপস্থিতি এবং প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে সংসদ, তথা স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের শক্তিশালী ভূমিকাকে কার্যত বিলুপ্ত করেছে।

সমগ্র ভারতের নির্বাচনের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বেশিরভাগ মানুষ ভেবেছিলেন যে গতবারের তুলনায় রাজ্যটিতে এবার বিজেপি ভালো করবে, এমনকি আসনও বেশি পাবে। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নির্বাচনী কৌশল ও উজ্জীবিত প্রচারণার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানানো উচিত। কারণ, তিনি এককভাবে হিন্দুত্ববাদের জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দলীয় প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করেছেন।

ভারতের নির্বাচন থেকে আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপলব্ধি হলো, ধর্মভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণার গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে যে দেশে গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রয়েছে, সে দেশের ভোটারদের এমন প্রচারণার ক্ষতিকর প্রভাব বোঝার মতো জ্ঞান রয়েছে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সৎ সাহসও রয়েছে।

আমাদের কাছে; যাদের প্রতিটি নির্বাচন নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক চলতে থাকে; ভারতের নির্বাচন একটি ঈর্ষণীয় বিষয়। কারণ, এখন পর্যন্ত দেশটির কেউই এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা এর ফলাফল নিয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ তোলেনি।

সাত ধাপে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রতিটি ধাপের ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে সংরক্ষিত ছিল এবং নির্বাচন শুরুর ৪৪ দিন পর সব প্রক্রিয়া শেষে এই ফলাফল তারা প্রকাশ করেছে। প্রায় ১০০ কোটি নিবন্ধিত ভোটারের এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ইভিএমের মাধ্যমে। ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্রতিটি ইভিএমে ছিল পেপার ট্রেইল। অথচ, আমাদের জনগণের বিশ্বাস অর্জনে ইভিএমের গ্রহণযোগ্য ব্যবহার এখনো সুদূর পরাহত। সর্বশেষ নির্বাচনের পরে এই বিশ্বাস আরও কমেছে।

ভারতের নতুন নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি

আমরা এই বিশাল প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্রের বিজয়কেও উদযাপন করছি, যাদের সঙ্গে আমরা পারস্পরিক সুবিধার জন্য অংশীদারিত্ব তৈরি করেছি। ভারতের ভোটারদের রায় প্রকাশের পরপরই এই ফলাফল ও সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপলব্ধি সারা বিশ্ব, তথা এ অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়, কারণ আমাদের ভোটাররাও ভারতের ভোটারদের মতো একই রকম ক্ষমতা প্রত্যাশা করেন।

ভারতের নির্বাচনে এটা প্রমাণিত যে পপুলিজমের রূপ, বিভক্তির রাজনীতির বিপদ ও ভোট পেতে ধর্ম ব্যবহারের ক্ষতি একজন বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ভোটারের চোখ এড়ায় না। কারণ, এসব ব্যবহার করে সমর্থন আদায় করতে চাইলে শেষ পর্যন্ত তার চরম মূল্য সাধারণ মানুষকে দিতে হয় ঘৃণা আর একে অপরকে দূরে ঠেলে দিয়ে।

ভারতের নির্বাচন আরও একবার প্রমাণ করেছে যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে 'জনরায়' সবসময়ই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। অপরদিকে, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দিলে তা গণতন্ত্রের ভিতকে ধ্বংস করে দেয়।

(লেখক দ্য ডেইলি স্টার-এর সম্পাদক ও প্রকাশক)

ভারতের নির্বাচন সমাপ্ত হল

শুভ বসু

ভারতের নির্বাচনের ফলাফল কী হতে পারে , সেই বিষয়ে আমি রাজনৈতিক ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার ফেসবুকে যা বলেছিলাম তা মূলগত ভাবে মিলে গেছে। শুধু পশ্চিমবাংলা বাদ দিয়ে। কারণ এই মাধ্যমে সব সময় হিসেবে করে কথা বলা হয় না। আমার নিজের একটা রাজনৈতিক আবেগ আছে দায়বদ্ধতা রয়েছে তা আমার পেশাদারি চিন্তা কে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল বিজেপি কান ঘেঁষে জিতবে এবং উত্তর প্রদেশ বিহার রাজস্থান মহারাষ্ট্রে হারবে। কিন্তু এই নির্বাচনের মূল বিষয় কি? বহুদিন আগে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম শ্রী সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তার বক্তব্য ছিল ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিকতা থাকবে এবং আঞ্চলিক সমীকরন ভারতের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঢেউ একটি বিশেষ মুহূর্তের বিষয় কারণ ভারত একটি সভ্যতা, জাতি রাষ্ট্র নয়। সেই সভ্যতার আশ্রয়ে বহু জাতিসত্ত্বার অবস্থান রয়েছে ভাষার ভিত্তিতে ,সংস্কৃতির ভিত্তিতে এবং আঞ্চলিক শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে।

ভারতের এই বহুজাতিক অবস্থান সব থেকে ভালো বুঝতেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৯২০ সালে তিনি যখন কংগ্রেসের সংগঠন ঢেলে সাজাচ্ছেন একটি গণআন্দোলনের ভিত্তিতে জনভিত্তিক পার্টি তৈরী করার জন্যে তখন তিনি বোম্বে প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি প্রভৃতির ভিত্তিতে পার্টি তৈরী না করে ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ কমিটি করেন। স্বাধীনতার বহু পূর্বে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের অঙ্গীকার কংগ্রেস করেছিল । তার কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে ভারতের জনগণের প্রথম পরিচিতি ভাষার ভিত্তিতে বা তাদের আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে এবং ভারত একটি বহুজাতিক সভ্যতা।বাংলা অঞ্চলে ১৯২৩ সালে শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস কেন বেঙ্গল প্যাক্ট করেছিলেন কারণ তিনি বাংলার মধ্যেকার ভাষা ভিত্তিক ঐক্য কে গুরুত্ব দিতেন। তা নইলে বাংলার শ্রেণী বিন্যাস, জাতপাতের সমীকরণ আর হিন্দু মুসলমান, তফসিলি জাতির ধর্মীয় সমীকরণ বাংলা ভাগ করে দেবে। ভারতে ১৯২০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল এবং যার প্রতীক হিসাবে গান্ধী নেহেরু প্যাটেল এবং আজাদ উঠে এসেছিলেন তার ফলে ভারতের একটি সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল। ব্রিটিশরাগণতন্ত্র করেন নি। তাঁরাকরেছিলেন আমলাতন্ত্র এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে তৈরী নির্বাচক মন্ডলী যা জনসংখ্যার মাত্র ১৪ ভাগকে ভোট দিতে দিতো।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পরেই কিন্তু ভারত সরকার কে ভারতীয় ইউনিয়ন বাঁচাতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন করতে হয়। পুরো ১৯৫২ সালের থেকে আজ অব্দি কতগুলি রাজ্য গঠিত হয়েছে তা হিসেবে করে দেখলে আমার যুক্তির গুরুত্ব অনুভব করতে পারবেন। ভারতের এই বহুত্বের মধ্যে সংযোগের সেতু হলো সংবিধান এবং গণতন্ত্র।

নেহেরুর আমলের পর শ্রীমতি গান্ধী যখন কংগ্রেসের সংগঠন ভাঙলেন এবং সংগঠনের সর্বস্তরে নির্বাচন বন্ধ করে দিলেন তখন থেকেই কংগ্রেসের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার আবেগ ধরে রাখা সম্ভব হলো না। তখন থেকেই নির্বাচনে আঞ্চলিকতার প্রকাশ দেখা গেলো। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন যদি ধরেন উত্তর ভারতে জনতা পার্টি, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেস। ১৯৮০ সালের পর থেকে ভারতে আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান এবং ভারতীয় রাজনীতি নির্ভর করেছে বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বিন্যাসের মধ্যে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো ১৯৮৪ র নির্বাচন শ্রীমতি গান্ধীর মৃত্যু , ১৯৯১র নির্বাচন রাজীব গান্ধীর মৃত্যু আর ২০১৯ এর নির্বাচন যা হলো জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের বহিপ্রকাশ। কিন্তু এছাড়া বাকি সব নির্বাচন কিন্তু জোটধর্মের সরকার ১৯৮৯ এর পর থেকে। এক জাতি এক ধর্ম এক ভাষা এক নেতা এখানে অলীক স্বপ্ন যা ভারতের বহুত্ববাদী সভ্যতার চরিত্র বিরোধী।

উত্তর প্রদেশে বিজেপির বিপর্যয়

অমিতাভ সিংহ

সদ্য অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি - কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোটের অভূতপূর্ব সাফল্য আগামীদিনে ঐ রাজ্যের ফ্যাসিস্ত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই এর একটি জোরালো ভিত তৈরী করেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তার জোট সঙ্গীদের নিয়ে ৮০ টি আসনের মধ্যে ৬৪ (৬২২)টি আসনে জয়লাভ করেছিল।তা এবারে নেমে এসেছে ৩৩ টিতে। বিএসপি বেশ কয়েকটি আসনে ভোট না কাটলে বিজেপি যে আরো ১৫ টি আসন হারতো তা পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে।সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের আসন গতবারের জেতা ৬ (৫ ও ১) টি থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৩ (যথাক্রমে ৩৭ ও ৬) টি। বহুজন সমাজ পার্টির গতবারের জেতা ১০ টি আসন কমে শূণ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মাত্র দুই বছর আগে ২০২২ এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ৪০৩ টি আসনের মধ্যে বিজেপি জয়ী হয় ২৫৫ টি আসন অর্থাৎ আগেরবারের (২০১৭ সাল) চেয়ে ৫৭ টি কম। অন্যদিকে সমাজপার্টি পার্টি গতবারের (২০১৭ সাল) চেয়ে ৬৪ টি আসন বাড়িয়ে ২০২২ সালে ১১১ টি আসনে জয়ী হয়। এর অর্থ একটাই যে বিজেপি বা যোগী সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীর ক্ষোভ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর নিরন্তর আক্রমণ ,আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি,ঘৃণার রাজনীতি, বুলডোজার সংস্কৃতি, মহিলাদের ওপর নির্যাতন ইত্যাদি এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ন্যাশান্যাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো অনুযায়ী এই রাজ্য এইসব পরিসংখ্যানের নিরিখে দেশের সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে। মজার কথা রামমন্দির নির্মাণ ও তার উদ্বোধন করে মোদী যোগীরা যে ধর্মীয় ঢেউ তুলে এই রাজ্যে সহজে জয় পাবে বলে ভেবেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে বললে কম বলা হয়।আদৌ

কাজ করেনি রাম মন্দিরের আবেগ। অযোধ্যার রামমন্দির যে লোকসভা কেন্দ্রের আওতায়, সেই ফৈজাবাদেই হেরেছে বিজেপি। জিতেছেন সমাজবাদী পার্টির অবধেশ প্রসাদ, জাতে দলিত। অ-সংরক্ষিত আসনে দলিত প্রার্থী দেওয়া, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো রাজ্যে রীতিমতো 'রাডিকাল' ব্যাপার। পাসি সম্প্রদায়ের সেই দলিত প্রার্থী শুধু জেতেননি, ফৈজাবাদের সবক'টি বিধানসভায় হেরেছে বিজেপি।এই প্রথম, ফৈজাবাদ সংসদে পাঠালো কোনও দলিত প্রার্থীকে। বিজেপির বহুচর্চিত স্লোগান ' অযোধ্যা তো ঝাঁকি হ্যায়, মথুরা-কাশী বাকি হ্যায় ' -র পালটা সমাজবাদী পার্টির স্লোগান ছিল 'না মথুরা, না কাশী, আবকি বার অবধেশ পাসি।' মানুষ তা গ্রহণ করেছেন।

যে রাজ্যে রামন্দির, সেই উত্তরপ্রদেশেই হেরেছেন মোদীর ছ'-ছ'জন মন্ত্রী। শুধু মোদীর ছয় মন্ত্রী নন, হেরেছেন যোগীর দুই মন্ত্রীও। এই নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও রাজ্যের ১৬ জন মন্ত্রী রাখতে পারেননি তাঁদের বিধানসভা। ডাবল ইঞ্জিন-ই বেলাইন! বারাণসীতে মোদীর ব্যবধান গতবারের পৌনে পাঁচ লাখ থেকে কমে এসে দাঁড়িয়েছে দেড় লাখে। রাজ্যের মোট ৮০ আসনের মধ্য পঁচাত্তর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি জিততে পেরেছে সাকুল্য ৩৩ আসনে (শরিকরা পেয়েছে মাত্র একটি, বিপরীতে ইন্ডিয়া মঞ্চ জিতেছে ৪৩ আসনে)। যেখানে গত লেকসভায় বিজেপি পেয়েছিল ৬২টি আসন,২০১৪-তে ৭১টি আসন। উত্তরপ্রদেশকে বিজেপি মনে করে হিন্দুত্বের গড়। রামমন্দিরের নামে চলেছে উগ্র হিন্দুত্বের কর্মসূচী।এহেন রাজ্যেই বিজেপি-র ভোট কমেছে ৯ শতাংশ। অযোধ্যা অঞ্চলে ন'টি লোকসভার মধ্যে বিজেপি হেরেছে পাঁচটিতে। গতবার যেখানে জিতেছিল সাতটি আসনে। শুধু অযোধ্যা নয়, হেরেছে বারাণসী অঞ্চলেও। বারোটি কেন্দ্রের মধ্যে বিজেপি জিতেছে মাত্র তিনটি আসনে। হেরেছে ৯টি আসনে। অযোধ্যা, বারাণসী, হিন্দুত্বের খাসতালুকেই জমি হারিয়েছে বিজেপি।

ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্র যার অন্তর্গত অযোধ্যা সেখানে তো বিজেপি হেরেছেই। রামায়ণ অনুযায়ী রামের বনবাসের একটা বড় সময় কেটেছে যেখানে সেই চিত্রকূটে হেরেছে বিজেপি। রামের সঙ্গে জড়িত সীতাপুর, বস্তি, সুলতানপুর, এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ), রামটেকের মত জায়গাতে বিজেপির পরাজয় প্রমাণ করে দেশে রামকে ভাঙিয়ে বিজেপির রাজনীতি আর চলবে না। আর যতদিন যাবে তত ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে ভোটে জেতা কমতে থাকবে।মোদীর জেতার ব্যবধানের লক্ষ ঠিক করা হয়েছিল আট থেকে দশ লক্ষ,হয়েছে মেরেকেটে দেড় লাখ।এই ব্যবধান তলানিতে নামাও একটা সংকেত। তবে মনে হয় সেরাজ্যের মানুষ এটাও বুঝতে পারছে মোদীরা আসলে নাথুরামের ভক্ত রামের নয়। তারা রামের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসকে নিয়ে ব্যবসা করে মাত্র।তাই বোধহয় রাম ভক্তদের

এটা প্রতিশোধ।

এই নির্বাচন নিয়ে লোকনীতি সিএসডিএস এর সমীক্ষা জানাচ্ছে সাধারণ জাতি (জেনারেল কাস্ট),উচ্চবর্ণ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বিজেপিকে ভোট দিয়েছে অকাতরে। অন্যদিকে ওবিসি,তপশীল জাতি,উপজাতি, সংখ্যালঘুদের সমর্থন গিয়েছে সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেস জোটের পক্ষে। সঙ্গে যাদব ও অযাদব ভোটও। বিএসপি জাটভ সহ সর্বত্র তাদের সমর্থন হারিয়েছে। এই জাটভ ভোটই ছিল বিএসপির প্রাণশক্তি । এবারে এদের সমর্থন পেয়েছে ইন্ডিয়া জোট। বিজেপি যে সামাজিক কৌশল অনুসরণ করে তাদের প্রার্থী ঠিক করে তার পাল্টা কৌশল নিয়ে সমাজবাদী পার্টি এবারে পিছড়ে বর্গদের মধ্যে থেকে অধিকাংশ প্রার্থী নির্বাচন করে। ৩২ জন প্রার্থী ওবিসি সম্প্রদায়ের, ১৬ জন দলিত,১০ জন উচ্চবর্ণের ও ৪ জন মুসলীম সম্প্রদায়ের প্রার্থী দিয়েছিল তারা।

দ্বিতীয়ত বিজেপি সাংসদেরা তাদের এলাকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না। তাসত্বেও বিজেপি ৪৯ জন সাংসদকে প্রার্থী করেছিল যাদের মধ্যে ২৭ জনই পরাজিত হয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের তিন বা তার চেয়ে বেশীবার জেতা ৩৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০ জনই পরাজিত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী (আমেথি),অজয় মিশ্র টেনি (খেড়ি), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্জীব বালিয়ান (মুজফফরনগর), স্বাধ্বী নিরন্জনা জ্যোতি –ত্ত (ফতেপুর), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধী (সুলতানপুর)। জয়ীদের মধ্যে আছেন মোদী, রাজনাথ সিং ও হেমা মালিনী।

বিজেপির বিভিন্ন নেতারা নির্বাচনী প্রচারের প্রথম থেকে সংবিধান পরিবর্তনের ভয় দেখিয়েছিল। এর ফলে দলিত, ওবিসি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বার বার ৪০০ আসন জেতার কথা বলার ফলে তাদের সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। তপশীল জাতি উপজাতি মানুষেরা মনে করে কংগ্রেস আমল থেকে তাদের জন্য দেওয়া সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হবে। যে মোদী এতদিন নিজেকে ওবিসি বলে প্রচার করে আসছিলেন ও তার ফলে এতদিন বিজেপি তাদের ভোট পাচ্ছিল,সেই ওবিসিরা তাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। মোদীর প্রচার,'কংগ্রেস তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য যে সংরক্ষণ আছে তা কেড়ে নিয়ে কংগ্রেস, মুসলমানদের দিয়ে দেবে', জনগণ বিশ্বাস করেনি। আসলে মিথ্যাবাদি, উদ্ধত, অকর্মণ্য, ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারবারিদের জনগণ বেশীদিন বিশ্বাস করে না।রাশিয়ার জার বা রোমানিয়ার চেসেস্কু তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

দেশে পরাজিত মোদি, বঙ্গে বামপন্থীরাও

নন্দন রায়

ইতিহাসের পরিহাস এটাই যে , যে রাজনৈতিক নেতাটি বুক বাজিয়ে হুঙ্কার দিয়েছিল, আব কি বার ৪০০ পার, সেই নেতাটি লোকসভা নির্বাচনে ২৭২-এর সীমানাটাও পার হ'তে পারেননি, কিন্তু আবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসেছেন। এনডিএ জোট হিশেবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ঠিকই, ফলে তারাই যে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পাবে সেই কথাটাকে কেউ প্রশ্নের মুখে ফেলছে না, প্রশ্নটা হ'ল নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের আলোচ্য হামবড়াটি যে দলের নেতা, সেই দলটি এনডিএর বৃহত্তম দল হলেও বিজেপি কিন্তু একক ভাবে ২৪০-এই আটকে গিয়েছে, ২৭২ ছুঁতে পারেনি। ফলে যে নেতাটি ৪০০ আসন জিতে আসবো ব'লে তিন মাসের প্রচার পর্বের সমস্ত সময়য়টা জুড়ে সারা দেশে চড়কিবাজি খেলেন , দেড়শোর ওপরে জনসভা এবং কয়েক ডজন রোড-শো করলেন , কখনো কাঁদলেন, কখনো হাসলেন , ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বললেন, নিজের দেশবাসীর একাংশকে যা নয় তাই ব'লে গালি দিলেন, নিজেকে পরমাত্মা প্রেরিত অজৈব সত্তা ব'লে অভিহিত করলেন, এবং এতসব কাণ্ড করেও গত দশ বছরের বিজেপির গৌরব গাথায় চোনা ঢেলে ২৪০ আসনের জয়কে পরাজয়ের মত বিষাদগ্রস্ত ক'রে তুললো, তখন ভাবা হয়েছিল এবার বোধহয় বিজেপিরই অন্য কোন নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবে।

এই রকম ভাবনার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। যদি কেউ নির্বাচনী পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন তাহ'লে দেখা যাবে যে এনডিএ জোট যেখানে মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৩.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে, সেখানে ইন্ডিয়া ব্লক পেয়েছে ৪১.৬ শতাংশ এবং অন্যরা পেয়েছে ১৫.১ শতাংশ। অর্থাৎ যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে তফাৎ মাত্র ১.৭ শতাংশ ভোটের। তার মানে মোদি-ম্যাজিকের শেষ পর্ব সমাগত। অথবা অন্য কথায় বললে, মোদিকে মানুষ আর দেশের কর্ণধার হিশেবে দেখতে চাইছেন না। দেশের মধ্যে মোদি যেখানে যেখানে সভা ইত্যাদি করেছেন, তার দুই-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে ব্যক্তি মোদির এই প্রত্যাখান, তার নৈতিক পরাজয়ও বটে। সেইজন্য তাঁকে 'পরাজিত মোদি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মোদি নয়টি সভা করেছেন এবং দমদম ও কলকাতা উত্তর কেন্দ্র মিলিয়ে একটি রোড-শো করেছেন, এর মধ্যে মাত্র চারটি কেন্দ্রে বিজেপি জয় পেয়েছে। মোদিকে মানুষ দেখেছেন বড়লোকদের এবং উচ্চবর্ণের বন্ধু হিসেবে। উত্তরপ্রদেশের ফলাফল সবচেয়ে চমকপ্রদ। সেখানে এনডিএ উচ্চবর্ণের৭৯%, মধ্য ও নিম্ন বর্ণগুলির সিংহভাগ ভোট গিয়েছে ইন্ডিয়া ব্লকের বাক্সে। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিশেবে কাকে দেখতে চান, এই প্রশ্নের উত্তরে ৩২% বলেছেন মোদির নাম ৩৬% বলেছেন তাদের পছন্দ রাহুল গান্ধী (lokniti-CSDS survey– The Hindu–8 June)। ফলে এটা আশা করা যেতেই পারে যে মোদি দেয়ালের লিখন পড়েছেন, অন্য কেউ এবার প্রধানমন্ত্রী হবেন।

এ ছিল ক্ষণিকের ভ্রান্তি। নরেন্দ্র মোদি ২৭২ পার হতে না পারা এই নির্বাচনী পরাজয়কে 'মহা বিজয় ব'লে অভিহিত করলেন। অর্থাৎ তিনি 'অশ্বথামা হত' বললেন, 'ইতি গজ'টা আর বললেন না। এটা যে বিজেপির গত দশ বছরের নিম্নতম স্কোর, এবারে সরকার গড়তে হ'লে যে শরিক দলগুলিকে ভাল মত জায়গা ছাড়তে হবে, প্রতিটি পলিসিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে যে শরিক নেতাদের কথা শুনতে হবে। দু'ঘন্টার নোটিশে নোটবন্দী অথবা মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার ভাঙিয়ে বিজেপি সরকার গড়ার ঘৃণ্য খেলাটি শেষ হওয়ামাত্র চার ঘন্টার নোটিশে যেভাবে দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষিত হয়েছিল সে সব মানুষ-মারা চমকপ্রদ খেলা খেলতে তিনি যে অভ্যস্ত ছিলেন, সেসব এখন চলবে না। কারণ এখন আর 'মোদি সরকার' নেই, এখন 'ইতি গজ'টা বলতেই হবে;এনডিএর সরকার, তার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কিন্তু মোদি এইসব আলোচনা-ফালোচনায় অভ্যস্ত নয়। তিনি গুজরাত না দিল্লী কোথাকার একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে MA in the Entire Political Science-এ ডিগ্রি লাভ করেছেন কিন্তু তার শংসা-পত্রটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। (এখানে পাঠককে একটি সাবধানবাণী শুনিয়ে রাখা লেখকের কর্তব্য;২০১১ সালে তৃণমূলের গদী দখলের পরে মমতাদেবীও ডঃ মমতা ব্যানার্জী লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু যেখান থেকে তিনি ডক্টরেট পেয়েছিলেন, সেই ইষ্ট জর্জিয়া ইউনিভার্সিটিকে ধরাধামে খুঁজে না পাওয়ায় তিনি অতঃপর উপাধিটি ত্যাগ করেন। একই ভাবে সারদা-নারদ-রোজভ্যালি থেকে শুরু ক'রে কয়লা পাচার গোরু পাচার সহ নানাবিধ কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পরে, চাকরি বিক্রি কেলেঙ্কারি খবরের কাগজের হেডলাইন হওয়ার আগেই তৃণমূল দল 'অফিসিয়ালি' নেত্রীর নামের আগে ত সততার প্রতীক শব্দবন্ধটি লেখা ত্যগ করেছে। সুতরাং 'চিটিংবাজ' মোদির সঙ্গে তার তুলনা করাটা ঠিক নয়।)

আজ নয়, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময় থেকেই মোদি তার তীব্র মুসলমান বিদ্বেষ, হিংস্র প্রতিশোধ পরায়ণতা, প্রবল আত্মপ্রেম ইত্যাদি ফ্যসিস্ট একনায়কত্বের গুণাবলী প্রর্শন করতে কুণ্ঠিত হননি। ফলে সবাইকে নিয়ে চলার ধাত তার নেই। কিন্তু তিনি কূটবুদ্ধিতে দড়। মনে আর মুখে এমন দ্বিচারিতা সহজে দেখা যায় না। তাই এখনো পর্যন্ত চন্দ্রবাবু নায়ডু ও নীতিশ কুমারকে অন্ধ্র ও বিহারের জন্য বিশেষ প্যাকেজের লোভ দেখিয়ে বাগে রেখেছেন বটে এবং এইভাবে সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করার পর্বটি হয়তো মোদি পেরিয়ে যাবেন, কিন্তু পাঁচ বছর ধরে এইরূপ ট্রাপিজের খেলার পাত্র তিনি নন। তিনি এখন থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় আছেন কীভাবে জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ফলে পুরো পাঁচ বছর সময়টা এনডিএ সরকার যে চলতে পারেনা এইকথা বুঝতে রকেট সায়েন্স জানার দরকার পড়ে না।

এটা মোদিও জানেন। কিন্তু তিনি তো চুপ ক'রে বসে থাকার পাত্র নন। কিন্তু তিনি কী করতে পারেন ? প্রথম সম্ভাবনা, তিনি যে খেলায় দক্ষ সেটাই করবেন। তিনি দল ভাঙাতে পারেন। যে অজস্র ছোট ছোট দলগুলিকে নিয়ে এনডিএ অথবা ইন্ডিয়া ব্লক গড়ে উঠেছে, তিনি তাদের নিয়ে নতুন জোট তৈরী করতে পারেন অথবা তাদেরকে বিজেপির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করতে পারেন। এই খেলায় অসুবিধের দিকটি হ'ল, ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি তো বটেই, এমনকি এনডিএ জোটের বেশির ভাগ দলই বিজেপির বিদ্বেষের এবং গরীব-বিরোধী রাজনীতির স্বাভাবিক মিত্র নয়। নায়ডু-নিতীশ থেকে শুরু করে ছোট-খাটো যে দলগুলি আছে

তাদের ভিত্তি জাতের সমীকরণ। ফলে তাদের আলাদা অস্তিত্ব না থাকলে জাতের রাজনৈতিক আকাঙ্খাই বিঘ্নিত হবে। মোদির পক্ষে কাজটা অত সহজ নাও হ'তে পারে। অবশ্য নয়া উদারবাদের জমানায় রাজনৈতিক আনুগত্য সহ সব কিছুরই পণ্যায়ন ঘটেছে। ইন্ডিয়া ব্লকের সুবিধের দিকটি হচ্ছে এদের মধ্যে একটা মতাদর্শগত নৈকট্য রয়েছে।

ব্যতিক্রম অবশ্যই তৃণমূল। তার ইতিহাসই বলে দেয় মতাদর্শ ব'লে তাদের যদি কিছু থাকে তাহ'ল লুণ্ঠনের মতাদর্শ। উপরন্তু মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অগ্রাধিকার হ'ল ভাইপোর জেলযাত্রা ঠেকানো এবং শুষে ছিবড়ে করে দেওয়া রাজ্যটির দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর মত টাকার জোগান সুনিশ্চিত করা। তাই হয় এখুনি ইন্ডিয়া ব্লকের পক্ষ থেকে পালটা সরকার গঠনের চেষ্টা করা উচিত(যেখানে তৃণমূলের শাঁসালো অংশিদারী থাকবে), অথবা মোদির সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তাই ভোটের পরে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রথম বৈঠকের পরের দিনই অভিষেক বন্দোপাধ্যায় প্রথমে দিল্লীতে অখিলেশ যাদব এবং মুম্বাই উড়ে গিয়ে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করে একটি জিঞ্জার গ্রুপ তৈরী ক'রে এখুনি সরকার গড়ার জন্য ঝাঁপাতে চেষ্টা করেছিলেন। ইন্ডিয়া নেতৃবৃন্দের প্রাজ্ঞতার কারণে সেই প্রচেষ্টা আপাতত সফল হয় নই। অতএব মমতাকে দ্বিতীয় পথটি বেছে নিতে হবে। ভোটপর্বে যেমন 'ইন্ডিয়া ব্লকে আছি কিন্তু নেই' খেলাটি নেত্রী খেলছিলেন, ভোট পরবর্তী পর্বেও সেই খেলাটি কিছুদিনের মধ্যে শুরু করবেন ব'লে আশঙ্কা হয় কারণ মোদিকে সন্তুষ্ট রাখতে হ'লে ইন্ডিয়া ব্লকের অন্দরে অস্থিরতার বাতাবরণ জরুরি। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের কারণে ইন্ডিয়া ব্লক থেকে বেরিয়ে যাওয়া চলবে না।

মোদির পক্ষে দ্বিতীয় অপশনটি একটু ঝুঁকির; কোনো একটা জোরালো ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট উচ্চগ্রামে তুলে নিয়ে গিয়ে আজাদ কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য যুদ্ধে যাওয়া। ইতিমধ্যে কাশ্মীরে জঙ্গীরা তীর্থযাত্রীদের ওপরে হামলা চালিয়েছে। কিছুদিন পরে রয়েছে অমরকন্টক যাত্রা। যেহেতু গত দশ বছরে দেশের সামরিক বাহিনীর যথেষ্ট রাজনীতিকরণ হয়েছে, তাই এই জুয়াখেলায় সেনাবাহিনীর সেনানায়কদের সমর্থন পাওয়া যাবে। মোদি তখন সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসে সকল কাঁটা উৎপাটন করে ক্ষমতায় ফিরবেন। যদি এই আশঙ্কা সত্যি হয় তবে সেটা হবে ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তিম যাত্রা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নিট ইউজি বিতর্ক ২০২৪

ডঃ সংঘমিত্রা চ্যাটার্জী

২০১৬ সাল থেকে সর্বভারতীয় স্তরে ডাক্তারির একটাই প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু হয় – যার নাম নিট NEET - National Eligibility cum Entrance Test। একমাত্র নিট ইউজি পরীক্ষার মাধ্যমেই সরকারি বা বেসরকারি কলেজে ডাক্তারি পড়া যায় । ভারতবর্ষের বাইরে কোন দেশে ডাক্তারি পড়তে গেলেও নিট ইউজি পরীক্ষাতে পাস করতে হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হতে গেলে ভারতবর্ষে দুটি অভিন্ন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস্ করতে হয় – নিট ইউজি (MBBS) এবং নিট পিজি (MD/MS)। প্রতি বছর NTA – ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এই নিট ইউজি এবং নিট পিজি পরীক্ষাটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকে।

কিন্তু এবার এক অঘটন ঘটে গেছে , যা নিয়ে সারা দেশ উত্তাল – নানারকম প্রশ্ন উঠছে নিট ইউজি পরীক্ষাএবং রেজাল্ট নিয়ে। প্রথমেই জানিয়ে রাখি মাত্র এক লক্ষ মেডিকেল সিটের জন্য ৫ মে ২০২৪ নিট ইউজি পরীক্ষাতে বসেছে ২৪ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী। গতবারের থেকে তিন লক্ষ বেশি। এক লক্ষ মেডিকেল সিটের মধ্যে মোটামুটি ৫০ হাজার সরকারি মেডিকেল সিট আছে সারা ভারতবর্ষে, আবার তার মধ্যে ৬৫ শতাংশ নানারকম সংরক্ষণ। এবার মূল বিতর্কের বিষয়ে আসা যাক , কেন এতো প্রশ্ন উঠছে ?

নিট ইউজি ২০২৪ এর রেজাল্ট বেরোনোর কথা ছিল ১৪ জুন ২০২৪ এ। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেলো ৪ জুন রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে ! আশ্চর্য ! সেদিন তো লোকসভা ভোটের রেজাল্ট বেরোলো এবং তার মধ্যেই হঠাৎ করে নিট ইউজির ভুলে ভরা রেজাল্ট ১০ দিন আগে বেরিয়ে গেল।

যে যে আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো প্রথমেই নজরে এল তা আমি এখানে তুলে ধরছি। এই প্রথম নিট পরীক্ষাতে বেনজির ভাবে ৭২০ এর মধ্যে ৭২০ পেয়ে ৬৭ জন পরীক্ষার্থী প্রথম হলো। কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতে এরকম আগে হয়েছে বলে কারো জানা নেই। এর মধ্যে আবার হরিয়ানার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রেই ৬ জন পেয়েছে ৭২০ তে ৭২০ ! যাদের রোল নম্বর খুব কাছাকাছি, একই সিরিজের । এর পরের দুটি নম্বর হলো ৭১৮ এবং ৭১৯ ! এবং এরাও ওই পরীক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ ৬ জন প্রথম, একজন করে দ্বিতীয় আর তৃতীয় – সবার সিট পড়লো একই পরীক্ষাকেন্দ্রে এবং আশাকরি

সবার জন্মস্থান ও হরিয়ানা ! এর থেকে মনে হচ্ছে দেশে 'টপারের' সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ! সত্যি সত্যি দেশে আচ্ছে দিন এসে গেছে।

দু নম্বর অসঙ্গতিটি হল যারা ৬৮ এবং ৬৯ রাঙ্ক করেছে তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৭১৮ এবং ৭১৯। যেটা এই পরীক্ষাতে কোনো মতেই পাওয়া সম্ভব নয়। নিটের মার্কিং স্কিম অনুযায়ী ১৮০ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ৪ নম্বর মেলে ও ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যায়। তাই ৭১৮, ৭১৭, ৭১৯ এগুলো কোনোমতেই পাওয়া সম্ভব নয়। সব উত্তর ঠিক হলে ৭২০, একটা প্রশ্ন ছাড়লে নম্বর হবে ৭১৬ আর একটা উত্তর ভুল হলে ৭১৫।

এরপর তিন নম্বর অসঙ্গতি। 'গ্রেস মার্ক'- উপহার হিসাবে প্রদান করা হল তাদেরকে যাদের প্রশ্নপত্র দিতে কর্তৃপক্ষের দেরি হয়েছে। উপঢৌকন দেওয়া হল নিট এর মতো এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষাতে ।রেজাল্টের অসঙ্গতির খবর ইউটিউব, টুইটার এ আসতেই নিট পরিচালন কারী সংস্থা এনটিএ - (ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি) এর মহানির্দেশক মিস্টার সুবোধ কুমার সিং টুইটারে ঘোষণা করলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সময় নষ্টের কারণে অনেক পরীক্ষার্থীকে কিছু নম্বর 'গ্রেস' দেওয়া হয়েছে! 'কম্পিটিটিভ এক্সাম' এবং 'গ্রেস মার্ক্স' - তার উপর আবার পরীক্ষার নাম 'নিট ইউজি' ? কিছুই বোধগম্য হলো না। নিট ইউজি ২০২৪ এর ইনফরমেশন বুলেটিনও গ্রেস মার্কের কথা বলা নেই। ২৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে খেলা !

কবে সেই ২০১৮ এর একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গ্রেস মার্ক দেওয়া হয়েছিল কোনো একটি পরীক্ষাতে, সেই অনুযায়ী 'গ্রেস মার্ক্স' দেওয়া হয়েছে - এমনি দাবি এনটিএর। সেই পরীক্ষাটি ছিল অনলাইন এক্সামিনেশন এবং পরীক্ষার্থী র সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। যাই হোক সেই কোর্ট অর্ডার এর কোনো কপি এখনো এনটিএ দেখায় নি। ২০২৪ এর নিট ইউজি ইনফরমেশন বুলেটিনে ও কোনো গ্রেস মার্কের গল্প ছিল না। কাদের এই গ্রেস মার্কের সুযোগ দেওয়া হল এবং কি ভাবে কত নম্বর দেওয়া হল তার কোনো জবাব এখনো এনটিএ দিয়ে উঠতে পারে নি। এনটিএ এর বক্তব্য যে ১৫৬৩ জন স্টুডেন্টকে গ্রেস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওদের জানা তালিকার বাইরেও প্রচুর পরীক্ষাকেন্দ্রে ৪-৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে। তাহলে সেই সব পরীক্ষাত্রীরা কেন গ্রেস মার্ক পাবে না ? কোন কেন্দ্রে কত সময় নষ্ট হয়েছে সেটা কখনোই সঠিক ভাবে জানা সম্ভব নয়। সেখানে ওরা সিসিটিভি এর গল্প বলছে। আমার প্রশ্ন , সিসিটিভি দেখে কিভাবে ঠিক করা যাবে কোন কোন স্টুডেন্টকে গ্রেস দেওয়া উচিত ?

এরপর আসছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গল্প। নিট পরীক্ষার দিনই অভিযোগ ওঠে প্রশ্নপত্র আগের দিন বিকালে বিহারে ফাঁস হয়ে গেছে এবং সেই কথাটা ৬ মে অনেক সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়। বিহারে কয়েকজনকে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য গ্রেফতার করা হয়। তারা এখনো জেল বন্দী। কিন্তু এখন নিটের মহানির্দেশক বলছেন যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সাথে আসল প্রশ্নের কোনো মিল নেই। অন্তত ২০ থেকে ২৫ বার বলেছেন ' transparent exam' চমৎকার! ফাঁসের অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং দাখিল করেছেন প্রেস রিলিজ এ - রাজস্থানের একটি মাত্র সেন্টারে শুধু গন্ডগোল হয়েছে , সেটার ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল থেকে একটা পরিষ্কার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে যে প্রশ্নপত্র নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। বহু পরীক্ষাত্রী পাটনা তে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে এসে অন্য আরেকটি প্রশ্নপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখেছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য সেটি হুবুহ এক ছিল নিট ২০২৪ এর প্রশ্নপত্রের সাথে। তাহলে এনটিএ কেন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র টি দেখাচ্ছে না ?

একটা পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার জন্য পুরানো কয়েকটি বছরের নিটের রেজাল্ট আলোচনা করছি তাহলে আরো সহজেই বোঝা যাবে ২০২৪ এর রেজাল্ট কত ভয়াবহ। সর্বভারতীয় রাঙ্ক '১০০০' এর প্রাপ্ত নম্বর প্রত্যেক বছর কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে আগে দেখে নেওয়া যাক ২০১৬ - ৫৬৪, ২০১৭ - ৬২৭, ২০১৮ - ৬১০, ২০১৯ - ৬৫০, ২০২০ - ৬৭৫, ২০২১ - ৬৭৫, ২০২২ -৬৭৬ , ২০২৩ - ৬৮৬ এবং ২০২৪-৭০৭। গতবছরের নিট (২০২৩) পরীক্ষার রেজাল্টের সাথে এবছরের নিট পরীক্ষার রেজাল্টের তফাৎ নিচের টেবিলটি থেকে সহজেই অনুমেয়। প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ২০২৩ এর সর্বভারতীয় রাঙ্ক কী ছিল আর এবছর কী হলো!

প্রাপ্ত নম্বর	সর্বভারতীয় রাঙ্ক ২০২৩	সর্বভারতীয় রাঙ্ক ২০২৪
৭১৬	৩	৭২
৭০০	২৫০	১৯৩৯
৬৫০	৭২২৮	২৭৪০০
৬০০	২৮২০০	৮০০৫০

যদি ধরে নেওয়া যে নিট পরীক্ষাটিতে কোনরকম অনিয়ম হয় নি তাহলে এটা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কিভাবে

প্রশ্নপত্রের মান প্রতি বছর খারাপ হচ্ছে ।উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ২০১৬ থেকে ২০২৩ অবধি ৯৯ টা চ্যাপ্টার ছিল নিট এর সিলেবাসে, এবছর সেখান নিট পরীক্ষাটি হয়েছে ৬৯ টি চ্যাপ্টারের উপর। ৩০ টি চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনো কারণ ছাড়া। এবং সিলেবাস ছোট করতে গিয়ে কোনো নিয়ম কানুন মানা হয় নি। এর ফলস্বরূপ ভালো প্রশ্ন করার জায়গাটা খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে অথচ ভালো ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

অথবা গত দুতিন বছর ধরেই নিট পরীক্ষাতে অনিয়ম চালু হয়ে গেছে! এবছর সেটা খোলস থেকে বেরিয়ে পড়েছে । কিন্তু একটা কথা বলতেই হবে – কোন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান এতো লঘু হতে পারে যে প্রথম স্থান পাওয়া ৬৭ জনের মধ্যে মাত্র ২৫ থেকে ৩০ জন (৫০ শতাংশ এর কম) ভারতবর্ষের সেরা মেডিকেল কলেজে ('দিল্লি এইমস'– AIIMS DELHI ভর্তির সুযোগ পাবে ! বাদবাকি ৩৭ জন পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়েও সেকেন্ড বেস্ট কলেজ পাবে। ৭২০ এর মধ্যে ৬৫০ পেয়েও এবার কোন সরকারি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে কিনা জানে না। সেখানে ২০২৩ সালে ৬৫০ পাওয়া স্টুডেনটি কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলো। CBSE/ISC/ উচ্চমাধ্যমিক – নানারকম বোর্ড পরীক্ষার সাথে তাহলে কি তফাৎ থাকলো ? প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে লাভটাই বা কি হলো ? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ?

গত দু তিন বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে একই নম্বর ৭০০ –৮০০ জন পেয়ে বসে আছে। সুতরাং একই নম্বর পেয়েও ছাত্রছাত্রীদের অল ইন্ডিয়া রাঙ্কের একটা বিশাল পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে।উদাহরণস্বরুপ বলা যাক, ৬০৬ নম্বর পেয়ে কারো রাঙ্ক ২৩৫০২ আবার কারো রাঙ্ক ২৪৩৮০ , সেইজন্য রাঙ্ক অনুযায়ী কলেজও পাল্টে যাচ্ছে।

ডাক্তারি প্রথম বছরের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ক্রমাগত 'রিপিটার' এর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে এবং তার ফলে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে। যে কোনো বড় কোচিং সেন্টার গুলোতে এখন আলাদাভাবে 'রিপিটার্স ব্যাচ' তৈরি হচ্ছে।২০২২ সালে একটা খুব নামকরা কোচিং সংস্থার একটি সেন্টারে পনেরো খানা (১৫) 'রিপিটার্স ব্যাচ' ছিল এবং প্রত্যেকটা ব্যাচে ৭০ থেকে ৮০ জন করে স্টুডেন্ট ছিল। স্বভাবতই একটা বিশাল পরিমান ছাত্রছাত্রী নিট ইউজি দুবার করে দিচ্ছে এবং একই সাথে লক্ষণীয় যে তিনবার / চারবার নিট ইউজি দেওয়ার সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ।

এই রকম অব্যবস্থা চললে আমরা ভবিষ্যতে কেমন ডাক্তার পেতে চলেছি সেটা আমি আপনি সকলেই অনুমান করতে পারছি। ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ না জানিয়ে আমরা সঠিক ডাক্তার তৈরি হওয়ার রাস্তাটা মসৃণ করার কথা ভাবতে পারি। চলুন, আমাদের নিজেদের কথা ভেবে আমরা নিজেরাই এগিয়ে আসি এবং প্রতিবাদ জানাই, যাতে আমি আপনি এবং আমাদের প্রতিবেশী সকলেই ভবিষ্যতে ভালো চিকিৎসক এবং চিকিৎসা পেতে পারি।

"অথবা গত দুতিন বছর ধরেই নিট পরীক্ষাতে অনিয়ম চালু হয়ে গেছে! এবছর সেটা খোলস থেকে বেরিয়ে পড়েছে।কিন্তু একটা কথা বলতেই হবে – কোন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান এতো লঘু হতে পারে যে প্রথম স্থান পাওয়া ৬৭ জনের মধ্যে মাত্র ২৫ থেকে ৩০ জন (৫০ শতাংশ এর কম) ভারতবর্ষের সেরা মেডিকেল কলেজে ('দিল্লি এইমস'– AIIMS DELHI ভর্তির সুযোগ পাবে !"

সর্বশেষ সংবাদে জানা গেলো কেন্দ্রীয় সরকার জনমত ও সুপ্রিম কোর্টের চাপে গ্রেস মার্ক দেবার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। যে ১৫৬৩ জনকে গ্রেস মার্ক দেওয়া হয়েছে তারা আবার পরীক্ষা দিতে পারবে।৩০ জুন ওই পরীক্ষা হবে।যারা তা দেবে না তাদের ফল বেরোবে গ্রেস মার্ক বাদ দিয়ে। তাতে প্রথম স্থানাধিকারীদের সংখ্যা কমে হবে ৬৭ থেকে ৬১ ।গোটা ঘটনায় NTA'র ডিরেক্টরের পদত্যাগ ও সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত দাবি করেছে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেছেন কোনও দুর্নীতি হয় নি। প্রশ্ন উঠেছে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের বহু ছাত্র কেনো গুজরাটের একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। ওই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের রেজাল্ট কী? আই.এস.সি. তে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি তে অনুত্তীর্ণ হয়ে নিটে প্রথম হওয়া যায়? কোন জাদুমন্ত্রের বলে ?

লেখিকা, প্রিন্সিপাল, ক্যামেলিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি , বাদু, কলকাতা, ৭০০১২৮।

মুখের কথা যখন ইতিহাসের আকর

মিলন দত্ত

আদিম কাল থেকেই মানুষ মৌখিক পরম্পরা বা কথ্য পরম্পরার ওপর বিশ্বাস রেখে তার ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। বস্তুত 'ওরাল হিস্ট্রি বা 'মৌখিক ইতিহাস' হল ইতিহাসচর্চার আদিরূপ। পুরনো দিনে লিখিত ইতিহাসের কোনও ধারনা না থাকায় মৌখিক পরম্পরাই ছিল অতীতকে ধরে রাখার একমাত্র উপায়। ইউরোপে কথ্য পরম্পরায় সংরক্ষিত তথ্যাদি ব্যবহার করে ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয় প্রাচীন গ্রিসে। দুই গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং থুসিডিডেস প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে মৌখিক প্রতিবেদন ব্যবহার করেছেন ব্যাপক ভাবে। প্রাক-সাক্ষরতা সমাজে মৌখিক বয়ানই ছিল ইতিহাস। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই কত কত লিখিত ইতিহাস রচিত হয়েছে মৌখিক বয়ানের ওপর নির্ভর করে। পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডিডেস পেলোপোলেসিয়ার যুদ্ধে ইতিহাস রচনা করেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে। তাঁর কথায়, 'আমি ওই প্রতিবেদনগুলো যতটা সম্ভব অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছি।' অষ্টম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে সেন্ট বেডে যে 'হিস্ট্রি অব দ্য ইংলিশ চার্চ অ্যান্ড পিপল' নামে যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন তা তৈরি হয়েছিল 'অগণিত বিশ্বস্ত প্রত্যক্ষদর্শী, যাঁরা ঘটনা এবং তথ্যাদি জানতেন বা মনে রেখেছিলেন'; তাঁদের ওপর নির্ভর করে।

মৌখিক ইতিহাসের আধুনিক ধারনা গড়ে ওঠে ১৯৪০-এর দশকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালান নেভিস এবং তাঁর সঙ্গীদের উদ্যোগে। অধ্যাপক অ্যালান নেভিস ১৯৪৮ সালে প্রথম আমেরিকার কিছু বিখ্যাত মানুষের মৌখিক বয়ান লিপিবদ্ধ করে তৈরি করেন 'পারসনস সিগনিফিক্যান্ট ইন আমেরিকান লাইফ'। 'বিখ্যাত মানুষ'-এর ধারনার বিপরীতে ইংল্যান্ডে মৌখিক ইতিহাসের রূপকার জর্জ এওয়ার্ট এভনাস ১৯৫৬ সালে রচনা করেন 'আস্ক দ্য ফেলো হু কাট দ্য হে'। সেটা ছিল ইংল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলে কিছু গ্রামের সাধারণ চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা মৌখিক বয়ান। লেখকের কথায়, ওই সব গ্রামের 'প্রবীণ মানুষেরা যেন হেঁটে চলে বেড়ানো বই'।

এখন অবশ্য অনেক দেশেই মৌখিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছে। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মৌখিক পরম্পরা মান্যতা পাচ্ছে। আদালতের সওয়াল জবাবকেও মৌখিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এছাড়া আছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাজনৈতিক বা অন্যান্য সভা এবং জনসভার ভাষণ। ওয়াশিংটনে ১৯৯৩ সালে তৈরি 'হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়াম'-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি গণহত্যা থেকে বেঁচে ফেরা সত্তর হাজার মানুষের মৌখিক বয়ান সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ইতিহাস নির্মাণে মৌখিক বয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মৌখিক ইতিহাস হতে পারে কল্পিত (subjective) এবং ব্যক্তিনির্ভর; কিন্তু সেটাই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। কথ্য বয়ানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ইতালির প্রখ্যাত মৌখিক ইতিহাসকার আলেসান্দ্রো পোরতেল্লি বলেছেন, ' যা করেছেন শুধু সেইটুকু আমাকে বলবেন না, তারা কি করতে চেয়েছিল, তারা তাদের কৃত্য বিষয়ে কি বিশ্বাস করত, সেই কাজ সম্বন্ধে এখন তারা কি ভাবছে। তাদের সেই অনুভবের প্রভাবে বয়ান করা বৃত্তান্ত ইতিহাস রচনায় ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক যতটা চাক্ষুস করা তথ্য।'

আবার শ্রমিক শ্রেণী, নারী, জাতিগত সংখ্যালঘুদের মতো মানুষ, প্রচলিত ইতিহাস যাদের প্রান্তিক করেছে বা ব্রাত্য করে রেখেছে, মৌখিক ইতিহাসে ব্যক্তিগত ভাবে বা গোষ্ঠী হিসেবে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কথ্য ইতিহাস নতুন তথ্য, বিকল্প ব্যাখ্যা এবং ভিন্ন অন্তর্দৃষ্টি সংযোজন করতে পারে, ইতিহাসচর্চায় যার গুরুত্ব অপরিসীম। মুখের কথায় যে আবেগ এবং অনুভূতি থাকে তা লিখিত শব্দের মধ্যে কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা বাচনভঙ্গীও ধরে রাখা যা মৌখিক ইতিহাসে।

কিন্তু মৌখিক পরম্পরা থেকে সংগৃহীত ইতিহাস নির্ভরযোগ্য কিনা তা নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। ইতিহাসের যে কোনও সূত্র নিয়েই কিছু সমস্যা থেকে যায়। তবে তথ্য ও নথি দিয়ে সমর্থিত ইতিহাসের থেকে মৌখিক সূত্র নির্ভর করে নির্মিত ইতিহাস অধিক পক্ষপাতদুষ্ট বা একপেশে, এমনটা বলা যায়

না। আমরা মৌখিক বয়ানকে কতটা গুরুত্ব দেব তা নির্ভর করে ইতিহাসচর্চা নিয়ে আমাদের ধ্যানধারনার ওপর। তবে মৌখিক উপাদান নির্ভর ইতিহাসচর্চায় অনেক সময়েই অনন্যসাধারণ কিছু সুযোগ এসে পড়ে কিংবা একটা ভিন্ন উপলব্ধিতে পৌঁছনো যায়। প্রাচীন আরব সমাজ ছিল মৌখিক এবং স্মৃতি নির্ভর। ওই সমাজে ইতিহাস, আচার, প্রথা এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কবিতা, গাথা এবং কাহিনিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। শিশুদের শেখানো হত দশ এমনকী বিশ পুরুষের বংশবৃত্তান্ত। প্রাচীন আরবে একেই বলা হত হাদিস। সেই অর্থে হাদিস আরব সমাজের ঐতিহ্যও বটে। ইংরেজি অনুবাদে হাদিস তাই Tradition। আরবি হাদিস শব্দের প্রকৃত অর্থকে খানিকটা খাটো করে এনে ইসলামে মুহাম্মদের নথিভূক্ত আদেশ, নির্দেশ, কথা ও কাজকেই হাদিস বলা হয়। নবির অনুমোদিত অন্যের কথা ও কাজ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে এগুলো বেশিভাগই স্মৃতিতে ধরে রাখতেন মুহাম্মদের সঙ্গী সাথীরা। পরে সেগুলো লিখে রাখা শুরু হয়।

২

দেশ বিভাগ পরবর্তী সময়ের প্রজন্ম এবং তার কারণে যাঁরা প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের মৌখিক বয়ান সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারভিত্তিক গবেষণামূলক কাজ করেছে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ডস (সেরিবান)। পরে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মণ্ডল ও পৌলোমী ঘোষালের গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় 'ধ্বংস ও নির্মাণ, বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ' নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে দেশভাগের প্রত্যক্ষ শিকার ও দ্বিতীয় প্রজন্মের মোট ৩১জনের সাক্ষাৎকারসহ তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনটি লেখা আছে। বইতে 'ভাঙা দিনের ঢেলা', 'স্বদেশ সন্ধান', 'বিজয়গড় এবং' ইত্যাদি পর্বসহ আছে দুটি পরিশিষ্ট। প্রথম পরিশিষ্ট চিত্র ও নথি এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্টে আছে তিনটি লেখা। তার মধ্যে বিখ্যাত শিল্পী গণেশ হালুইয়ের লেখাটির শিরোনাম 'স্বাধীনতা নয়, দেশ বিভাগের পঞ্চাশ বছর'।

উর্বশী বুটালিয়ার 'দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্স' ওই রকম আরও একটা বই। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে দেশভাগের ইতিহাসে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে। উর্বশী বুটালিয়া বিশ্বাস করেন, কথ্য ইতিহাস সূত্র হিসেবে ব্যবহার না করলে সত্যিকারের ইতিহাস রচনা সম্ভবই নায়। লিখিত সূত্রও থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলিও হওয়া দরকার অন্য রকমের সূত্র, যেমন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। তবে তাঁর প্রধান জোর সরাসরি সাক্ষাৎভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ওপর। 'দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্স' বইটি তিনি প্রধানত সেভাবেই তৈরি করেছেন। তিনি চেয়েছেন দেশভাগের ইতিহাসের মেয়েদের খুঁজে বের করে তাদের মুখে তাদের কথা শুনতে। কিন্তু উর্বশীর আশঙ্কা ছিল, পুরুষতন্ত্রময় মানস ভুবনে নারী তার নিজের কথা বলতে পারবে তো? তিনি চেষ্টা করেছেন পরিবারের আড়ালে তাদের সঙ্গে কথা বলতে। চেষ্টা করেছেন, তারা কি বলে তার থেকেও তারা কি 'না বলে' তার দিকে বেশি খেয়াল রাখতে। মেয়েদের কথ্য বয়ানের মাধ্যমে যে কণ্ঠস্বরকে উর্বশী তুলে আনতে চেয়েছেন, সাব অলটার্ন ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ তাকে বলেছেন, 'স্মল ভয়েসেস অব হিস্ট্রি'। মুখের কথায় রচিত ইতিহাস কতটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, তা নিয়ে সমালোচকেরা যে ভাবে কাটাছেঁড়া করেন তার জবাবও উর্বশী দিয়েছেন তাঁর বইয়ে; শুনে লেখা ইতিহাসকার যদি সমালোচিত হন, তাহলে পড়ে লেখা লেখা ঐতিহাসিকের কেন প্রাপ্য হবে না ওই একই সমালোচনা?

কথ্য বয়ান দিয়ে দেশভাগের ইতিহাস নির্মাণের কাজ করেছেন ঋতু মেনন এবং কমলা ভাসিন তাঁদের 'বর্ডার অ্যান্ড বাউন্ডারিজ উইমেন ইন ইন্ডিয়াজ পার্টিশান' বইয়ে। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত এটিই প্রথম দেশভাগে ভুক্তভোগী মেয়েদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এই ইতিহাস নির্মিত হয়েছে তাঁদের কথ্য বয়ান সংগ্রহ করে, তাঁদের কথায়।

মৌখিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ বই কলকাতা থেকে (জানুয়ারি ২০১৯) প্রকাশিত হয়েছে। সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত। সাত্যকি হালদার সম্পাদিত 'একাত্তরের রক্তস্মৃতি মহিলাদের মৌখিক বয়ান' নামে ওই বইয়ে যাঁদের মৌখিক বয়ান সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই জীবিত এবং প্রবীণা। তাঁদের বলা অভিজ্ঞতার

সংকলন এ বই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তৈরিতে মৌখিক বয়ানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। অনেক বই তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে।

মৌখিক ইতিহাসচর্চার কাজ বাংলাদেশে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত প্রায় ২৩ হাজারের মতো ঘটনার একটি সংগ্রহ। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এসব ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহের কাজ প্রথম বাংলা একাডেমি শুরু করে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমি এই কাজটি করেছে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ৭ম খণ্ডে বাংলা একাডেমির এসব সংগ্রহ লিপিবদ্ধ করা আছে। এরপর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই ধরনের ইতিহাস সংগ্রহের কোনো কাজ না হলেও ব্যক্তিগতভাবে কিছু কাজ হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৫৫টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাস রচনায় মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থানীয়ভাবে যে মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ করছে সেগুলো প্রত্যেক এলাকার আঞ্চলিক ইতিহাস হয়ে উঠছে। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার বাইরে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ঢাকায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শন করে। প্রদর্শনীর পর স্কুল শিক্ষার্থীদের বলা হয়, বাড়ির বা আশপাশের যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের কাছ থেকে সে সময়ের বিভিন্ন ঘটনা শুনে তা লিখে একজন শিক্ষকের মাধ্যমে ঢাকায় পাঠাতে। লিখিত ঘটনার মধ্যে বর্ণনাকারীর নাম, বয়স ও মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর অবদান উল্লেখ থাকে। হাতে লেখা এসব ঘটনা পাওয়ার পর তা যাচাই বাছাই করা হয়। সত্যতা নির্ণয় করা হয় বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে। এরপর সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণত তিনভাবে ঘটনাগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়, হাতে লেখা কপি, কম্পিউটার কম্পোজ এবং বই আকারে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগৃহীত মৌখিক বয়ানগুলো দিয়ে এ পর্যন্ত তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৫-র যে বইয়ের জন্য বেলারুশের লেখক শ্বেতলানা আলেক্সিভিচকে সাহিত্যে নোবেল দেওয়া হয় সেটি আসলে কথ্য ইতিহাস। বইটি হল 'ওয়ার'স আনওম্যানলি ফেস'। সোভিয়েতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে মৌখিক পরম্পরায় গেঁথেছেন শ্বেতলানা। যুদ্ধের বিধবাদের নিয়ে শ্বেতলানার ওই বইয়ের পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিত একের পর এক প্রকাশক, সেই বই ছাপা হয়ে ২০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। শুধু রুশ ভাষাতেই। 'ওয়ার'স আনওম্যানলি ফেসেস' বা 'যুদ্ধের অ-মেয়েলি মুখ' নামের সেই বইটি সম্বন্ধে নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'যন্ত্রণা আর লড়াইয়ের আশ্চর্য এক আখ্যান।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ, চেলোর্বিল দুর্ঘটনা এবং সোভিয়েতের পতন; এতটাই ব্যাপক তাঁর মৌখিক ইতিহাসের পরিসর।

তাঁর প্রথম বই 'ওয়ার'স আনওম্যানলি ফেস' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধের নিষ্ঠুরতার মধ্যে যাপন করেছিলেন রাতদিন, তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং দিনযাপনের মৌখিক বয়ান ওই বইটি। পরের বইও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'বেঁচে থাকাদের' নিয়ে; 'দ্য লাস্ট উইটনেসেস'। এ বার শিশুদের কথা। তাদেরই মুখে। পরের বইও শিশুদের নিয়ে। নাম 'জিঙ্কি বয়েজ'। জিঙ্ক, অর্থাৎ দস্তা। এই দস্তার কফিনে করেই আফগানিস্তান থেকে রুশ সেনাদের দেহ ফেরত আসত। যে সব সেনার অধিকাংশ নেহাতই কিশোর। ছেলে-হারা রুশ মা-বাবাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কথায় এই বই লিখেছিলেন শ্বেতলানা। ১৯৯৩ সালে বেরয় 'এনচ্যান্টেড উইথ ডেথ'। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অব্যবহিত আগে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায় রাশিয়ায়। কমিউনিজমের পতন এবং নতুন ব্যবস্থা মেনে নিতে পারছিলেন না অনেকেই। কমিউনিস্ট মতবাদ থেকে তাঁরা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছিলেন না, অথচ তার বিলুপ্তি যে অনিবার্য তা বুঝতে পারছিলেন। তাঁদের মৌখিক বয়ান গেঁথে গড়ে উঠেছিল তাঁর ওই গ্রন্থ। ১৯৯৯ সালে 'চেরনোবিল প্রেয়ার'; ভয়ঙ্কর পরমানু-বিপর্যয়ের যাঁরা শিকার তাঁদের কথ্য বয়ান। ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় 'সেকেন্ডহ্যান্ড টাইম'; সোভিয়েতের পতনের পরে পুরনো আর নতুন ব্যবস্থা বিষয়ে রাশিয়ার মানুষের মতামত কথ্য বয়ানে।

যে ধাঁচে লেখেন শ্বেতলানা, নিজে তার নাম দিয়েছেন ‘নভেল-কোরাস’। বহুস্বরের উপন্যাস। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁর লেখা সাজান। ইতিহাস রচনার এমন এক কাঠামো অনুসরণ করেন, যা একান্তই মৌখিক পরম্পরার। কোনও সময় বা দেশের ইতিহাস বুঝতে সাধারণ মানুষের মুখের কথাকে এখন যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুঁথি-নির্ভর ইতিহাসের পাশেই তাই স্বমহিমায় জায়গা করে নিয়েছে ‘ওরাল হিস্ট্রি’। শ্বেতলানাকে সাহিত্যিক খেতাব দিয়ে ‘মৌখিক ইতিহাস’কে নতুন সম্মান দিয়েছে নোবেল কমিটি।

কথ্য ইতিহাস চর্চায় এখন আগ্রহ গোটা বিশ্বজুড়ে। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ এখন প্রায় নিয়মিত কাজ। মৌখিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করা এবং উত্হাসিত করে মূল্যবান উপাদানগুলো সংরক্ষণের জন্য আমেরিকায় ১৯৬৭ সালে তৈরি হয়েছে ‘ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন’। ১৯৮১ সালে ব্রিটিশ মৈখিক ঐতিহাসিকেরা গড়ে তুলেছেন ‘ওরাল হিস্ট্রি সোসাইটি’।

ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিলের (১৭৭৩-১৮৩৬) বিখ্যাত বই ‘ ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস ‘ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। ব্যাপার হল, মিল কখনও ভারতে আসেননি।তাও ভারতের একটা আস্ত ইতিহাস লিখে ফেলেন তিনি! এই গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ। অর্থাৎ, প্রথম দুটি পর্যায়ের নামকরণ শাসকের ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে আর তৃতীয়টি শাসকের জাতির নামে। এই ত্রুটিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পর্ব-বিভাজনে ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতকে হিন্দু ও মুসলিম যুগে দ্বি-বিভাজিত করে ভারতের বহুধর্মীয় চরিত্রকে অস্বীকার করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, তথাকথিত হিন্দু যুগেও (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) মৌর্য, শক, কুষাণ প্রভৃতি বহু অহিন্দু রাজবংশের প্রবল অস্তিত্ব ছিল। মিলের পর্ব-বিভাজনে মুসলিম শাসনে ভারতীয় উপমহাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান প্রজা তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও তাদের সামাজিক প্রভাবের কথা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

বর্তমানে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের বিভ্রান্তিকর পর্ব-বিভাজনকে পরিবর্তন করে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ করা হয়েছে।এটি অবশ্যই একটি সঠিক পদক্ষেপ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ গত ১২ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সদস্য সঞ্জীব সান্যালের লেখা ‘Revolutionaries the other stories of how India own its Freedom’ শীর্ষক পুস্তকটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়ন যন্ত্র ও গদি মিডিয়ার সহায়তায় তিনি এখন ‘ঐতিহাসিক’। নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহরা এইবার মধ্যযুগ ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে পড়েছেন। উপরোক্ত বইটি লেখানো হয়েছে একজন অনুগৃহিত রাজকর্মচারীকে দিয়ে। যিনি আদৌ ইতিহাসের ছাত্র নন। এখন ইতিহাসের ছাত্র হন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, এবং অর্থনীতির ছাত্র হয়ে যান ঐতিহাসিক। এই লেখক বলতে চান সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। এরকম ভাবার স্বাধীনতা তাঁর অবশ্যই আছে। শুনতে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু তার স্বপক্ষে তথ্য ? আর গুপ্ত বিপ্লববাদি সংগঠন যথা অনুশীলন সমিতি , যুগান্তর দল , হিন্দুস্তান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি প্রভৃতি সংগঠনের সংগঠকদের কেউ কখনও হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হননি। ওই গ্রন্থের লেখক সঞ্জীব সান্যালের পিতামহ শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন বেনারসবাসী একজন সশস্ত্র বিপ্লববাদী, রাসবিহারী বসুর সহযোদ্ধা।দুবার সেলুলার জেলে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মকাহিনী ‘বন্দীজীবন’ পড়লেই জানা যায় মত ও পথের পার্থক্য সত্বেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন গত শতকের ৩০ এর দশকেই সমস্ত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির বিলুপ্তি ঘটে। শচীন্দ্রনাথ শেষজীবনে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুকেছিলেন।তবে বিপ্লবীরা ছিলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে

তার পরিপূরক। বাংলায় গত শতাব্দির দুইয়ের দশক থেকে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তরের অনেক নেতাই যথা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী , পূর্ণ চন্দ্র দাস, হরিকুমার চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুদা), অরুণ গুহ প্রমুখ বিপ্লবীরা বাংলার কংগ্রেসের গুদত্বপূর্ণ নেতা। তাঁদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ঘনিষ্ঠতা । বিপ্লবী অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'বক্সা ক্যাম্প' গ্রন্থে পাচ্ছি মহাত্মা গান্ধি দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাবার আগে বক্সা ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মতামত জানার জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাঁদের কাছে পাঠাচ্ছেন। বিপ্লবীরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ব্যার্থ হয়নি ।গান্ধিজি হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলে এসে বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করছেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে গান্ধিজির হস্তক্ষেপে মুক্তি পাবার পর, আগস্ট আন্দোলনে তাঁরা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

এখন হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এই বিপ্লবীদের সামনে রেখে ইতিহাস বিকৃত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি। মহাত্মা গান্ধি ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। তাঁদের বিরুদ্ধে এরা কখনও নেতাজি সুভাষ, আবার কখনও সরদার প্যাটেল বা শহিদ ভগৎ সিংকে স্থাপন করছে মনে রাখতে হবে তাঁরা সকলেই ছিলেন দৃঢ়তম ধর্ম নিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যোদ্ধা। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯২৩ সালে তাঁর ' হিন্দুত্ব' পুস্তকের মাধ্যমে 'দ্বিজাতিতত্ব' উপস্থিত করেন। এরই পরিপূরক ইসলামিক মৌলবাদীরা ওই দ্বিজাতিতত্ব কে হাতিয়ার করে ১৯৪০ সালে 'পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন করে। উভয় শক্তিই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তার পরের ঘটনাবলী সকলেরই জানা আছে।

হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। শুধু এদের প্রশ্ন করতে হয় যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আর.এস.এস ও হিন্দু মহাসভা কি করছিল ? এদের কোনও একজন নেতাও কি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন ? সে বিষয়ে মোদি ও অমিত শাহ কিছু বলছেন না কেনো ?

-শেষ

মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ঃ দুই গালে চার থাপ্পড়

মনিরুল হক

এক গালে এক নয়, দুই গালে দুই নয়; দুই গালে চার-চারটে থাপ্পড় কষাল মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়; উত্তর-পূর্ব ভারতের এই চার রাজ্যের জনগন। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই রাজ্যগুলি থেকে বিজেপি তথা এন ডি এ একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারে নি।

আমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে বিজেপি- আর এস এস এর মদতে গত এক বছর ধরে মনিপুরে চলছে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতি একসূত্রে গাঁথা কারণ উভয় জায়গায় আছে বিজেপি সরকার এবং তাদের পরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী সমতলের মেইতে আর পাহাড়ি এলাকার কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চলছে সশস্ত্র লড়াই। এ লড়াইয়ে অন্তত ২০০ জন মানুষ খুন হয়েছেন, ৬০০০০ মানুষ গৃহহারা হয়েছেন। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনা ঘটেছে অসংখ্য। মনিপুরের কোনো এক কোণে পড়ে থাকা অজানা কোনো গ্রামের দুর্বলতম মানুষ থেকে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান পার্লামেন্টের সদস্যরা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন রেখেছেন, তিনি যেন অন্তত একটি বারের জন্য মনিপুরে যান। কিন্তু তিনি যান নি। যাবেন কি করে ? গেলে তো তাঁকে বলতে হবে - ' মিত্রোও, আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি কারণ বিরোধ-অশান্তি-ধর্ষণ-খুন-অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আপনারা আমাদের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

আর একটু সময় লাগবে। নির্লজ্জ হলেও এতটা নির্লজ্জ তিনি এখনও হয়ে উঠতে পারেন নি! এবারের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির অনেক রথী-মহারথী পরাজিত হয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে দল ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছে, কিন্তু মনিপুরের মানুষ যেভাবে বিজেপির নগ্নতাকে উন্মোচন করে দিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই। বিজেপি এবং আর এস এস-এর চক্রান্তের ফাঁদে আটকে পড়লেও সেই ফাঁদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন মনিপুরের জনগন। ওঁরা এখনও যুযুধান। কিন্তু যুযুধান থেকেও এই নির্বাচনে একজোট হয়ে দু'দিকের দুটি

কেন্দ্র থেকেই তাঁরা এন ডি এ প্রার্থীদের পরাজিত করে বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন কংগ্রেস প্রার্থীদের। মেইতেই অধ্যুষিত ইনার মনিপুরে কংগ্রেসের প্রার্থী অধ্যাপক আংগোমচা বিমল আকোইজাম জয়লাভ করেছেন। পরাজিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী মনিপুর সরকারের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। অপরদিকে কুকি অধ্যুষিত আউটার মনিপুরে নাগা জনজাতির মানুষ আলফ্রেড কে এস আর্থার হারিয়ে দিয়েছেন বিজেপি সহযোগী নাগা পিপলস ফ্রন্টের প্রার্থীকে। এই দুটি আসন বিজেপি-আর এস এসের নীতি-আদর্শ-দৃষ্টিভঙ্গী-কার্যধারা প্রতি যথার্থই এক চপেটাঘাত।

মিজোরামে এই সেদিন পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। তারা দিল্লীর বিজেপি সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে রাজ্য শাসন করত। কিন্তু রাজ্যের মানুষ বিজেপির উপর এতটাই খাপ্পা যে গত বছরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সহযোগী এই মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টকে হারিয়ে ক্ষমতায় এনেছে জোরাম পিপলস ফ্রন্টকে। মনে রাখতে হবে মনিপুর থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের সিংহভাগ এবং মায়ানমার থেকে আসা ৩০০০০ এর বেশি শরনার্থীর জন্য এই জোরাম পিপলস ফ্রন্টই খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনে তাদের প্রার্থী রিচার্ড ভানলালহমাঙ্গাইহা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন।

একইরকম ভাবে নাগাল্যান্ডের মানুষও বিজেপিকে প্রতিরোধ করতে বেছে নিয়েছেন এবারের নির্বাচন কে। গত বছর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি জোট ৬০ এর মধ্যে ৩৭ টি আসনে জয়লাভ করে রাজ্যে সরকার গঠন করে।সেই নির্বাচনে কংগ্রেস একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারে নি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে নাগাল্যান্ড থেকে সেই কংগ্রেস দলের এস সুপঙ্গমেরেন জামির নির্বাচিত হয়েছেন।পরাজিত হয়েছেন বিজেপি সমর্থিত এন ডি পি পি দলের প্রার্থী চুম্বেন মেরি।

মেঘালয়ের দুটি আসন। তুরা আসনে জয়লাভ করেছেন কংগ্রেসের সালেঙ এ সাংমা। তিনি পরাজিত করেছেন বিজেপির সহযোগী ন্যাশনাল পিপলস পার্টির আগাথা সাংমাকে।আগাথা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সংমার বোন। অপর আসন শিলং-এ জয়ী হয়েছেন ভয়েজ অফ দি পিপল পার্টির রিকি এ জে সিঙ্কম।

আসামের ১৪ টি আসনের মধ্যে আগের বারের মত এবারও বিজেপি ৯টি এবং কংগ্রেস ৩টি আসন পেয়েছে। বিজেপির সহযোগীরা দুটো আসন পেয়েছে। দুর্নীতিতে ডুবে থাকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপিতে গিয়েই যেন-তেন-প্রকারেণ কংগ্রেসকে জব্দ করার খেলায় মেতে উঠেছেন। ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে তিনি বহু কংগ্রেস নেতাকে ভাগিয়ে নিয়েছেন। নিরন্তন কুৎসা করে চলেছেন রাহুল গান্ধীর প্রতি। ক্রমাগত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে চলেছেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা এবং তাঁর একদা মেন্টর তরুন গগৈ-এর প্রতি।আসাম কংগ্রেস দলের মুখ গৌরব গগৈ ছিলেন কালিয়াবর লোকসভা থেকে নির্বাচিত সদস্য।কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করে তিনি কালিয়াবর লোকসভাকেই তালিকা থেকে মুছে দিয়েছেন। বাধ্য হয়ে গৌরব গগৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জোড়হাট কেন্দ্র থেকে। গগৈকে হারাতে হিমন্ত বিশ্বশর্মা সর্বস্ব পণ করেছিলেন। মিথ্য, কুৎসা, উগ্রতা ছিল তাঁর বাহন। খরচ করেছেন বিস্তর টাকা-পয়সা। উগ্র জাতীয়তাবাদ দেখাতে গিয়ে স্থাপন করেছেন মধ্যযুগের অহোম রাজার সেনাপতি লচিত বরফুকনের মুর্তি। প্রধানমন্ত্রী এখানে দু'বার এসেছেন কংগ্রেসের প্রতি বিষোদ্গার করতে।তা সত্বেও গৌরব গগৈ জিতেছেন ১ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ভোটে।

অরুণাচল ও ত্রিপুরার দুটো করে আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি এবং সিকিমের একমাত্র আসন দখল করেছে সিকিম ক্রান্ত্রিকারী মোর্চা। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে মোট লোকসভার আসন ২৫ টি। গতবার বিজেপি ও তার সহযোগীরা পেয়েছিল ১৯ টি আসন। এবার পেয়েছে ১৫ টি আসন। বিরোধীরা পেয়েছে ১০ টি আসন। কিন্তু শুধু আসন সংখ্যা দিয়েই বিজেপির পিছিয়ে পড়া অবস্থাটা বোঝা যাবে না। শুধু মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব,কর্পোরেট পুঁজির দাসত্বের কারণেই নয়; নিজেদের সঙ্কীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল, ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির প্রতি চরম তাচ্ছিল্যের জন্য বিজেপিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে চরম প্রতিরোধের মুখে পড়তে হচ্ছে।আসামে নিজেদের আসন ধরে রাখতে পারলেও তারা ভোট পেয়েছে কংগ্রেসের থেকে কম। বিজেপি পেয়েছে ৩৭.৪৩% ভোট আর কংগ্রেস পেয়েছে ৩৭.৪৮% ভোট। ধুবড়ি আসনটি কংগ্রেস ১৫ বছর পরে আবার ফিরে পেল শুধু তাই নয়, জিতল ১০ লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে।

মেঘালয়ের তুরা ও নাগাল্যান্ডের আসন দুটি কংগ্রেস জিতল যথাক্রমে ২৫ ও ২০ বছর বাদে। লোকসভার সাথে বিধানসভার ভোটও হল সিকিমে। এর আগে দল ভাঙিয়ে বিধায়ক জোগাড় করে সিকিমে পা রাখলেও এবার তারা মোহমত্ত হয়ে একা লড়ল সিকিমে। লোকসভা তো দূরের কথা বিধানসভাতেও একটা আসন জুটল না তাদের কপালে। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়ে তাদের সহযোগী আঞ্চলিক শক্তিগুলিকেও মানুষ প্রত্যাখান করেছে। কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার স্বপ্নে ২০১৬ সালে কিছু আঞ্চলিক দলকে নিয়ে বিজেপি গঠন করেছিল 'নর্থ-ইষ্ট ডেমোক্রেটিক অ্যাল্যায়েন্স'। এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ওই অ্যালায়েন্স আসলে ছিল অগণতান্ত্রিক, বিভেদকামী এবং অপ্রয়োজনীয়। নির্বাচনের ফল এটাও প্রমাণ করে দিচ্ছে যে উত্তর-পূর্ব ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বাভাবিক সংহতি রক্ষার ব্যাপারেও বিজেপি এক মূর্তিমান অন্তরায়।

বাংলায় শাসক সফল, বিরোধীরা ব্যর্থ

মজিবুর রহমান

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। তাদের আসনসংখ্যা ৪২-এর মধ্যে ২৯ হয়েছে। ২০১৯-এর তুলনায় ৭টি বেড়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ৬টি আসন খুইয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস দুই থেকে এক হয়েছে। বামেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। শূন্য ছিল, শূন্যই রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এই ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। বিভিন্ন কথা উঠে আসছে।আসলে আমরা সারা বছর রাজনীতির মধ্যে থাকতে ভালোবাসি। বছরভর রাজধানীর রাজপথ থেকে প্রত্যন্ত প্রান্তরে রাজনৈতিক আলোচনা চলতেই থাকে।এত মিছিল মিটিং দেশের অন্য কোনো রাজ্যে হয় বলে মনে হয় না।আমরা বাঙালিরাই বোধহয় দেশের মধ্যে সবচেয়ে 'রাজনীতি সচেতন' জাতি!

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাধারণভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। ক্ষমতার কেন্দ্রে ঘন ঘন পরিবর্তন পছন্দ করে না।এজন্য একই দলকে একাধিকবার সুযোগ দেয়। স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা অথবা চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছাড়া সরকার বা শাসকদলকে ক্ষমতাচ্যুত করার কথা ভাবা হয় না। রাজ্যে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন সেই দলই সব ধরনের নির্বাচনে জেতে। এজন্য লোকসভার অধিকাংশ আসন রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে যায়। সিংহভাগ পঞ্চায়েত - পৌরসভা তারাই দখল করে। যেমন, ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ২৫ বছরের মধ্যে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২, এই ৫ বছর ছাড়া বাকি ২০ বছর লোকসভা, বিধানসভা ও পৌরসভার নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একাধিপত্য থেকেছে। ১৯৭৫ সালে দেশজুড়ে জারি করা জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের প্রশাসন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে দমনপীড়ন চালায়। এই অগণতান্ত্রিক শাসন সহ্য করতে না পেরে, ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক ইতিবাচক কাজ সত্ত্বেও মানুষ তাঁর সরকারকে সরিয়ে দেয়।তখন থেকে বামফ্রন্ট একাদিক্রমে সাতবার সরকার গঠন করে।২০০৬ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে শিল্প স্থাপনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। এই সময়ে বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জেরে বহু জায়গায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। রাজ্যের সুশীল সমাজ সরকারের বিরুদ্ধে 'পরিবর্তন চাই' আওয়াজ তুলে পথে নামেন। মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলে মাওবাদীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিদিন সহিংস ঘটনা ঘটতে থাকে। পরিস্থিতি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। একটা নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর ফলে বামফ্রন্টের জনসমর্থন দ্রুতগতিতে কমতে থাকে। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ও ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার বিদায় নেয়। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিধানসভার পাশাপাশি লোকসভা ও পঞ্চায়েত-পৌরসভার নির্বাচনেও বামেদের বিজয় রথ মসৃণ গতিতে ছুটতে দেখা গেছে। ২০১১ থেকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের জমানা শুরু হয়েছে। এখন সব নির্বাচনেই টিএমসি'র জয়জয়াকার চলছে। কাজেই সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনেও তাদের সাফল্যের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রী ও সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনেক অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতি একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। দুর্নীতির কারণে হাজার হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্প নেই। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে।এসবের জন্য সরকার বা শাসকদল প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ওপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা বিশ্বাস চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।বরং তাঁর সরকারের

লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্য সাথী, সবুজ সাথী, সমব্যথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি অর্ধ শতাধিক অনুদান মূলক প্রকল্প ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে কারণ এগুলো গরিব মানুষদের খুব কাজে লাগছে। অনেককেই হাত খরচের জন্য আর হাত পাততে হচ্ছে না। চিকিৎসা ও বিবাহের মতো জরুরি ও ব্যয়বহুল ব্যাপারে সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের দ্বারা ভীষণ ভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এই সব অনুদান দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের অংশ না হলেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া টেস্ট ক্রিকেটের থেকে এখন তো টি-টোয়েন্টির আকর্ষণই বেশি! এজন্য বিভিন্ন দিককার ঝড়ঝাপটা সহ্য করেও মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের অগ্রগমন চলছেই।

১৯৭৭ সাল থেকে পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকার পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ২০০১ সালে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হয়। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট ও ২০১৬ সালে জাতীয় কংগ্রেস বিধানসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি পায়। ২০২১ সালে বামফ্রন্ট ও জাতীয় কংগ্রেস শূন্য হয়ে যায় এবং বিজেপি ৭০-এর বেশি বিধায়ক নিয়ে বিরোধী দলের আসন দখল করে। কিন্তু বিজেপির উত্থান ঘটে আরও দুই বছর আগে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। এখন অধিকাংশ বুথে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি পদ্মফুলে ভোট দেয়। বাম-কংগ্রেসের যে কর্মী সমর্থকরা 'তৃণমূলের অত্যাচার' সহ্য করতে না পেরে বিজেপিতে এসেছিল তারা আর পুরনো দলে ফিরে যেতে চাইছে না। এজন্য যে বিজেপি ২০১৯ সালে হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল তারা আর দুম করে কমে যাচ্ছে না। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা ভিত্তিক ভোটের হিসাব অনুযায়ী বিজেপি ৯০টিতে এক নম্বরে ও ১৮০টিতে দুই নম্বরে রয়েছে। বাংলার মাটিকে বিজেপির জন্য এখন আর 'দুর্জয় ঘাঁটি' বলে মনে হয় না।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। ২০০১ সাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

জাতীয় কংগ্রেস আর কখনও 'রিকভারি' করতে পারেনি। যত সময় যাচ্ছে তাদের অবস্থা তত খারাপ হচ্ছে। জনসমর্থন ক্রমশ কমছে। কংগ্রেস ভীষণ ভাবে নেতৃত্বের সংকটে ভুগছে। রাজ্য স্তরের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ নিস্ক্রিয় হয়ে গেছেন। তাঁদের কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। ছাত্র-যুবদের মধ্য থেকে নতুন নেতৃত্ব উঠে আসছে না। লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে না। গোটা রাজ্যে একটাই মুখ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কিন্তু তিনি প্রদেশ সভাপতি হলেও তাঁর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড মূলত মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে তিনি নিজেও হেরেছেন। মালদা দক্ষিণ আসন বঙ্গ কংগ্রেসের মান রক্ষা করেছে। খোলনলচে পাল্টে না ফেললে কংগ্রেসের ভালো কিছু করা মুশকিল বলে মনে হচ্ছে।

বাংলায় বাম রাজনীতির একটা ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু সেই ঐতিহ্য আজ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ও ২০২১ সালের বিধানসভার পর ২০২৪ সালের লোকসভাতেও কোনো বামপন্থী প্রতিনিধি থাকছে না। ত্রিশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র একটি আসনে বামপন্থী প্রার্থী দ্বিতীয় হয়েছেন। তবে বামফ্রন্ট চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রচুর কর্মসূচি গ্রহণ করছে। ছাত্র যুবদের মধ্য থেকে বেশ কিছু উজ্জ্বল মুখ দলের নেতৃত্বে উঠে এসেছে। এদের মানুষ ভালোবাসে কিন্তু ভরসা করে না। তাই তাদেরকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত করার কথা ভাবে না। মানুষ হয়তো মনে করছে, এদের বক্তব্য এখনও একাডেমিক স্তরে আটকে আছে, বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না। বামেদের মিছিল মিটিংয়ে লোক ভালো হয় কিন্তু ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটে না। অর্থাৎ রাস্তার আন্দোলনে মানুষ বামপন্থীদের দেখতে চায় কিন্তু আইন বা নীতি রচনার দায়িত্ব দিতে চায় না। এমতাবস্থায় বামেদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

রাজ্যের ৮০-৯০ শতাংশ মানুষ টিএমসি ও বিজেপির মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে।ওই দুই দলের শক্তি না কমলে বাম-কংগ্রেসের কোনো চান্স নেই। মমতা ব্যানার্জির সরকার অত্যন্ত নিপীড়নমূলক আচরণ শুরু না করলে অথবা বিরোধীদের আন্দোলন প্রতিরোধে প্রশাসনিক ভাবে ব্যর্থ না হলে টিএমসি'র দ্রুত শক্তিহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। আদর্শগত লড়াইয়ের জায়গা থেকে বামেরা বিজেপির বিরুদ্ধে বেশি সরব হলেই বোধহয় বঙ্গ রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন আসতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের রাজনীতিতে কেউ অপরাজেয় নয়। যেকোন দিন পাশা উল্টে যেতে পারে। খেলা ঘুরে যেতে পারে। মানুষ আগে ঠিক করে কাকে সরাতে হবে, পরে ঠিক করে কাকে বসাতে হবে। রাজনীতি সম্ভাবনার শিল্প। কাজেই আশা ত্যাগ করলে চলবে না। প্রত্যাবর্তনের পথ কখনও পার্মানেন্টলি বন্ধ হয়ে যায় না।

সাজানো এক্সিট পোল ঃ শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি –এই হচ্ছে মোদীতন্ত্র

শুভাশিস মজুমদার

"বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ" – কবির কবিতার এই কথা কটি মোদীতন্ত্র কে বোঝাতে ব্যবহার করাই যায়। যদিও মোদীতন্ত্রের ব্যাপ্তি আরো বেশি ও ভয়ঙ্কর তার রূপ।এই তন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে আছে দেশের মূল ধারার টিভি ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রায় ৯০ শতাংশ, বিজেপির আইটি সেল-এর অধীন ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, এক্স (ট্যুইটার) হ্যান্ডেল এবং পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। মিথ্যা, ঘৃণাপূর্ণ, বিকৃত, বিভাজনকারী বিষয় নিয়েই এরা প্রচার করে থাকে বলে অভিযোগ। চলছে দেশবাসীর ব্রেনওয়াশ করার প্রচেষ্টা। ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্সের এজেন্সি দিয়ে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের উপর আক্রমণ, যার ৯৫% বিরোধী দলের।এই নেতারাই পক্ষ বদল করে বিজেপির পক্ষে আসলেই মামলা স্থগিত হয়ে যাচ্ছে।বিপক্ষ দলের নেতারা একে মোদীর ওয়াশিং মেশিন বলেছেন।ইলেকশন কমিশন ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের একাংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতপূর্ণ আচরণের অভিযোগ দৃশ্যমান।

"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!" – মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধী দল গুলির সার কথা এটাই তাই ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স – এর এই নির্বাচনে লড়াইটা বেশ কঠিন ছিল।অসম পরিস্থিতিতে লড়াই।

কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।বিরোধী দলের দুইজন মুখ্যমন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে জনসভায় মোদী ঘোষণা করলেন, বিজেপি ৩৭০ (কাশ্মীরের ৩৭০ ধারার প্রতি ইঙ্গিত করে !) এবং এনডিএ ৪০০ র বেশি আসনে জয়লাভ করবে।

মোদীর পক্ষে প্রচারের অঙ্গ হিসেবে গদি মিডিয়া প্রতি সন্ধ্যায় আলোচনা শুরু করে দিল কিভাবে এনডিএ ৪০০ র বেশি আসনে জয়লাভ করবে। যেন, এনডিএ – র জয় সুনিশ্চিত। মোদী অপরাজেয়। এই ভাবেই চলল দেশবাসীর মনোভাবকে প্রভাবিত করার কাজ। পক্ষপাত পূর্ণ ওপিনিয়ন পোল চালিয়ে এই প্রচারকে জোরদার করা হলো।

অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার প্রদীপ গুপ্ত, সি ভোটারের যশবন্ত দেশমুখ এবং নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরে (বিজেপির খারাপ ফলের আশঙ্কা যখন শুরু হয়েছে !) আবির্ভূত প্রশান্ত কিশোর এক্সপার্ট হিসেবে প্রচার চালাতে লাগলেন, মোদী ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য প্রধাণমন্ত্রী হতে চলেছেন।

নির্বাচন যত এগিয়েছে, ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ার আশঙ্কায় প্রধানমন্ত্রী বিভ্রান্তিকর ও বিভাজন মূলক ভাষণ দিতেও কসুর করলেন না। শুরু করেছিলেন রাম মন্দিরের আবেগে ভর করে নির্বাচনে জিততে। পরের পর্যায়ে বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের সোনাদানা , মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে অনুপ্রবেশকারী এবং বেশি সন্তান জন্ম দেওয়া মানুষদের (লক্ষ্য মুসলিম সমাজ) হাতে বণ্টন করে দেওয়া হবে। কোনো পরিবারে দুটি মোষ থাকলে, একটি কেড়ে নেওয়া হবে। ব্যক্তিগত ধণ সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার জিন্নার (পাকিস্তানের) মুসলিম লীগের অনুরূপ।

মোদীর এই অপপ্রচার, দেশবাসীর মনে কংগ্রেসের ইশতেহার সম্পর্কে আরো কৌতুহল জাগিয়ে তুলল, যা নজিরবিহীন।

মোদীর ভাষণ কে বিভ্রান্তিকর, ঘৃণাপূর্ণ এবং বিভাজন কারী হিসেবে চিহ্নিত করে এক্স হ্যান্ডেলে মন্তব্য করেন শিবসেনা (উদ্ধব) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানায় কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দল। যদিও নির্বাচন কমিশন কার্যত কোনো ব্যবস্থা মোদীর বিরুদ্ধে নেয় নি।

অপরদিকে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে অন্যান্য বিরোধী দলগুলি মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলি নিয়েই প্রচার চালিয়েছে। যেমন নজির বিহীন বেরোজগারি, মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুরের মত সমস্যা, চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, অগ্নিবীর প্রকল্পের কুপ্রভাব, যুবক ও কৃষকদের আত্মহত্যা, কৃষকদের দুর্দশা, দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় শিল্পপতি বন্ধুদের হাতে মোদীর তুলে দেওয়া, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ ইত্যাদি। একইসঙ্গে কংগ্রেসের ইশতেহারে ন্যায় প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের গ্যারান্টি প্রদান করা।

কর্নাটকের বিজেপি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী অনন্ত কুমার

হেগড়ে , সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি এবং উত্তরপ্রদেশে ফৈজাবাদ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লালু সিং একাধিকবার প্রচার করলেন যে মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ বেশি সংখ্যক আসনে জয়লাভ করলে সংবিধান বদলে ফেলা হবে। শেষ দুজনই এবার হেরেছেন। হেগড়ে এবার দাঁড়ায়নি।

নির্বাচন শেষে ১ জুন, প্রায় সমস্ত এক্সিট পোল (কম পক্ষে ১১ টি) বিজেপির জন্য ৩৫০, (আর এনডিএ র জন্য এমনকি ৪০০ টিরও বেশি) আসনের পূর্বাভাস দিয়েছে। যেন মোদীর মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই। এই নিয়ে গদি মিডিয়া ব্যাপক প্রচার চালায়। বিরোধী দল এই এক্সিট পোল গুলিকে অপপ্রচার বলে অভিহিত করে। রাহুল গান্ধি একে মোদী মিডিয়ার মিথ্যা এক্সিট পোল বলে আখ্যা দেন।

ডিজিটাল (বিকল্প) মিডিয়ার সাংবাদিকরা গ্রাউন্ড লেভেলের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এই এক্সিট পোলের ফলাফলের মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন মোদী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ এবং রাহুল গান্ধির ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রা কিভাবে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে। তাই লড়াই এক তরফা মোদীর দিকে নয়। ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যথেষ্ট ভালো ফল করবে, এমনকি সরকার গঠন করে ফেলতে পারে বলে তাঁরা জানান।

৪ জুন নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই নরেন্দ্র মোদীর দলের জন্য লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা এক্সিট পোলগুলি চূড়ান্ত ভাবে ভুল প্রমাণিত হয়। ফলাফলের পরে এক্সিট পোল সংস্থাগুলি থেকে নাটকীয়ভাবে জনসাধারণের কাছে একদিকে যেমন ক্ষমা চাওয়া হয়, আবার অপর দিকে এই ব্যর্থতা ঢাকতে নানা কারণ দেখানোর চেষ্টা করা হয়। তবে বিরোধী দল গুলির পক্ষ থেকে সম্ভাব্য কারচুপির জন্য এই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তদন্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে ।চূড়ান্ত ফলাফলে এনডিএ জোটের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৯৩টি ।বিজেপি নিজে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়নি।

এক্সিট পোলগুলি ৩ জুন বেঞ্চমার্ক ইক্যুইটি সূচককে রেকর্ড উচ্চতায় তুলে দেয়, যার একদিন পরেই শেয়ার মার্কেট ক্র্যাশ করে যখন প্রায় ৪০০ বিলিয়ন (৩৩,৩৬,২৮৪ কোটি)মূল্যের বাজার এক দিনেই মুছে ফেলা হয়। বিরোধী দলগুলি সম্ভাব্য কারচুপির জন্য পোলিং কোম্পানি এবং বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য দেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক (সেবি) এবং সংসদকে আহ্বান জানিয়েছে।

৫ জুন কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধি সাংবাদিকদের বলেন, 'বিজেপির উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা একটি কেলেঙ্কারি চালিয়েছে।' আমরা জানতে চাই এই নির্বাচনগুলি (এক্সিট পোল) আসলেই সম্পন্ন হয়েছিল কিনা, নির্বাচনের পদ্ধতি কী ছিল? এবং (শেয়ার মার্কেটে) এই বিনিয়োগকারী কারা?'

এক্সিট পোলের আগে, মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্টক মার্কেটে নিবেশের জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে এটি নির্বাচনের ফলাফলের দিনে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছাবে। দেশের কোন প্রধানমন্ত্রীর অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ধরনের আচরণ নজির বিহীন।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খর্গে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের মিটিংয়ে বলেন, এই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষতি হয়েছে এবং তাঁর নৈতিক পরাজয় হয়েছে।

মানবাধিকার কর্মী গৌতম নাওলাখার মুক্তি

সৌর বসু

ভীমা কোরেগাঁওয়ের ঘটনাটি ঘটে ২০১৮ সালে। ঘটনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ১৮১৮ সালের পেশোয়াদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও দলিত সম্প্রদায় ভুক্ত আর্মির যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দলিত সম্প্রদায় বর্ণবাদী অত্যাচারী পেশোয়াদের পরাজিত করেছিল।

যুদ্ধের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহারাষ্ট্রে, পুনের সন্নিকটবর্তী ভীমা কোরেগাঁও গ্রামে একটি বিশাল সমাবেশ আয়োজিত হয়। এই সমাবেশে দলিতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এক ঝাঁক মানবাধিকার কর্মী।

নরেন্দ্র মোদির সরকার এই সমাবেশের বিরোধিতা করে। যে সমস্ত মানবাধিকার কর্মী এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন, তাদেরকে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার আরবান নকশাল নামে অভিহিত করে। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয় মাওবাদীদের সঙ্গে তাদের সংযোগের।

এলগার পরিষদ মাওবাদী সংযোগ মামলায় ২০১৮ সালে গৌতম নাভলাখাসহ আরো ১৫ জন মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।। এর মধ্যে ফাদার স্ট্যান স্বামি, অসুস্থ অবস্থায় কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। কারাগারে থাকাকালীন তার প্রতি অমানবিক ব্যবহার করা হয়েছিল। গৌতম নাভলেখা চার বছর কারাবাস করার পর , মুম্বাইতে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন।সম্প্রতি তাকে জামিয়ে মুক্তি দেওয়া

হয়।

এই মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদিকে হত্যা করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।। মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবী সুধা ভরদ্বাজ, বর্ষিয়ান কবি ও বুদ্ধিজীবী, ভারভারা রাও, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মী গৌতম নাভলাখা, মানবাধিকার কর্মী অরুণ ফেরেরা ও ভারনন গঞ্জাল ভেজ কে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে জেলে ঢোকানো হয়।

গৌতম নাওলাখা একজন সক্রিয় মানবাধিকার কর্মী। তিনি পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটসের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া কাশ্মীরে মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের আহবায়কও ছিলেন। তার কর্মকাণ্ডের মূল ক্ষেত্র ছত্রিশগড়ের মাওবাদী এলাকা। কারাগারে থাকাকালীন গৌতম নাওলাখা তাঁর কারাগারের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। নিবন্ধটির কিছু অংশ নিচে পরিবেশিত হল

তকারাগারে প্রবেশ করে আমি একটি বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলাম, যেখানে প্রতিটি বন্দির নিয়ম মেনে চলা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কারাগারের ম্যানুয়ালটি জাতীয় নিরাপত্তার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবাইকে সেই ম্যানুয়াল দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র কয়েকজন অনুমতি পেয়েছিল তাও আবার জেইল সুপার এর কাছে আবেদন করার পরে। একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার থেকেও। মানুষ যখন বন্দি অবস্থায় থাকে তখন সংগ্রামী মানসিকতা একজন মানুষকে অসহায়তা থেকে মুক্তি দেয়। সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকা বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং অসফলতার বিরুদ্ধে জয়ী হবার মানসিকতা তৈরি করে।

'নিজের কথা বলতে গেলে আমার কাছে বই পড়ার জন্য, বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য, অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য অনেক সময় ছিল। আমি আমার সহ বন্দীদের কাছ থেকে অনেক প্রেরণা পেয়েছি, শক্তি সঞ্চয় করেছি। কারাগারের অন্তরালে নতুন মানুষদের সঙ্গে মিশে আমি অনেক কিছু জেনেছি, আবার আমার অনেক ধারণা বাতিল করতে সমর্থ হয়েছি। সেই কারণে আমার কারাবাস অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। বিচারের পর দোষী সমস্ত মানুষদের শাস্তি হিসেবে কারাগারে পাঠানোর কথা। কিন্তু ভারতীয় কারাগারে ৮০% মানুষ বিচারাধীন অবস্থায় বন্দী হয়ে রয়েছে। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগ বিচার বা দোষী সাব্যস্ত না করেই মানুষকে কারাগারে পাঠায়। প্রত্যেক বন্দিকেই জেল ম্যানুয়াল মেনে চলতে হয়। মহারাষ্ট্রের জেল ম্যানুয়াল বন্দীদের গান গাইতে অথবা উচ্চস্বরে হাসতে নিষেধ করে। আমি হাসা বা উচ্চস্বরে গান গাওয়ার নিয়মটি আপত্তিজনক বলে মনে করছি। যদি হাসির মতো কিছু থাকে আমি বা অন্য বন্দীরা কেন তা দমন করতে যাব। জোরে কথা বলার বিষয়টি নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের উপর। উচ্চ নিরাপত্তা সম্পন্ন নির্জন কারাবাসে কিভাবে বন্দিরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, যেখানে তাদের সেলগুলো দূরে দূরে অবস্থিত। সেখানে কথা বলতে গেলে অথবা একে অপরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে উচ্চস্বরে কথা বলার থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়।। আমাদের সহ অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকেই গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন এবং গানগুলি গেয়েছেন, সেক্ষেত্রে আমরাও গান গাইতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই কারণেই নৈরাজ্যবাদী নিয়মগুলি নিয়মিত ভাঙ্গা হয়েছিল ক্ষ্ম

২৬ নভেম্বর ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী তার মন কি বাত বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধান প্রথম এমেন্ড করা হয় মে, ১৯৫১ তে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই এই সংস্কারের কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেননি যে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের জন্য এবং দলিতদের বর্ণবাদীদের হাতে নিপীড়নের থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই সংস্কার করা হয়েছিল।

উপরন্তু তিনি বলেন তিনি এবং তার সরকার বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

তার এই বক্তব্যের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে পুলিশ সাতজন ছাত্রকে একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জয় উদযাপন করার জন্য বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (unlaw full activities prevention act) আইন প্রয়োগ করে গ্রেফতার করে। পুলিশ দাবি করে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা,যারা ভারতের স্বপক্ষে এবং পাকিস্তান বিরোধী, তাদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই কাজ করেছিল। এই ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে পুলিশ পিছিয়ে আসে। কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যারা সংকীর্ণতাবাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে,তাদের শায়েস্তা করা।

এসোসিয়েটেড ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম এর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে২২২ টির মধ্যে ৪৫টি বিল লোকসভায় একক বৈঠকে পাস করা হয় ।একই দিনে সংসদের উভয়কক্ষে আরো বিল পাস করেছে। এরই মধ্যে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিলটির মাধ্যমে একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন রাজ্যকে জম্মু ও কাশ্মীর দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। বিলগুলি সংসদে ঝাড়াই বাছাই না করে, কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। সুপ্রিম কোর্ট এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয় যে তড়িঘড়ি বিল পাস করলে নানাবিধ ত্রুটি থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে মামলার আধিক্য , সুপ্রিম কোর্টে কাজকে ব্যাহত করবে।

সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে দুটি ইউনিয়ন টেরিটোরিতে পরিণত করার মধ্যে কোন ত্রুটি পায়নি। উপরন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধকারী ৭০০০ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের কোন হেভিয়াস পিটিয়াস পিটিশন গ্রহণ করতে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট অস্বীকার করে। ভারত কোড, ঔপনিবেশিক এই যুগের ভয়ংকর পুলিশ রাজ ফিরিয়ে আনে। ভারতে এখনো উপনিবেশিক কালা পুলিশ আইন বহাল রয়েছে এবং এবং বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে তার বর্বোরোচিত প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে সাধারণ ফৌজদারি আইন অনুসারে, পুলিশ হেফাজতে অপরাধের মাত্রার উপর নির্ভর করে ১৫ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত আটক করে রাখা যেতে পারে।

আদালতের ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার, তল্লাশি এবং মানুষকে বিপর্যস্ত করার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা রাখে। বর্তমান ফৌজদারি আইনগুলি নাগরিকদের স্বার্থ এবং অধিকারকে কেন্দ্র রাখার পরিবর্তে নাগরিকদের কর্তৃত্বের অধীনে রাখার ব্যবস্থা সুগম করে।

আমাকে কম অপরাধে জড়িত করা হয় এবং বিচার ও দোষী সাব্যস্ত না করেই জেলে পাঠানো হয়। এটা আমার কাছে মনে হয় যে অধিকারের উপর আক্রমণ এবং কর্তব্যের আহবান, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের জন্য নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে সুশীল সমাজকে নিক্ষেপ করার যুক্তি দিয়ে পড়লে, যারা সরকারী বর্ণনাকে গ্রহণ করে না তাদের বিরুদ্ধে একটি কঠোর ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে।

অনুচিৎ গাঙ্গুলির আত্মকথন

মজিবুর রহমান

আমি কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি ছিলাম। আচমকা পদত্যাগ করে পলিটিক্সে নেমেছি। বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লোকসভা ভোটে লড়ে জিতেছি। হারিয়েছি হাঁটুর বয়সী দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে। আমি হারলেই আমার প্রেস্টিজ পাংচার হত। কিন্তু জয় কি আর শেষ পর্যন্ত উপভোগ্য রইল! অনেকেই অনুমান করেছিল, আমাকে দেশের আইনমন্ত্রী করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ডিস্টার্ব করার জন্য আমার হাতে এই মন্ত্রকটা তুলে দেওয়া হবে। আমিও আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু আশা তো পূরণ হল না। অনুমান মিলল না নরেন্দ্র মোদি তাঁর এই 'সৈনিক'কে আপাতত শুধু সাংসদ করেই রেখে দিলেন। আসলে সবই ভাগ্য, ভগবানের ইচ্ছে। অবশ্য কিছুদিন আগে আমি নিজেই 'ভগবান' ছিলাম। এখন কেউ বলে হনুমান, কেউ বলে শয়তান।

যাকগে, শুরুতেই আমি আমার শেষ বেলার কথা বললাম। এবার একটু আগেকার কথা বলবো।

আমি প্রায় দুই যুগ মানে চব্বিশ বছর কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছি। প্র্যাকটিস করেছি জুনিয়র হিসেবে, কখনও সিনিয়র হওয়া হয়নি। এক সময়, মানে এই তৃণমূল কংগ্রেসের জমানাতেই, এস এস সি-র হয়ে মামলা লড়তাম। কাজেই এস এস সি-র কাণ্ডকারখানা সব আমার জানা। ডাক্তারের কাছে রোগী যেমন তার বদভ্যাসের কথা বলতে বাধ্য হয় উকিলের কাছে মক্কেলও তার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা গোপন করে না। আমি ২০১৮ সালে উকিল থেকে বিচারপতি হয়ে গেলাম আর কিছুদিন পর থেকেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা আমার বেঞ্চে এসে গেল। একজন ডাকাত যদি পুলিশ হয়ে যায় তবে তার পুরনো গ্যাংয়ের ধরা না পড়ে উপায় থাকে না। তেমনি এতদিন অ্যাডভোকেট হিসেবে এস এস সি-র যেসব অনিয়ম, কারচুপি ও দুর্নীতিকে ডিফেন্ড করেছি, এখন জজ হিসেবে সেসবের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অর্ডার দিতে লাগলাম। এতদিন সরকারকে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম, এখন ফাঁসানোর দায়িত্ব নিলাম। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। এই বিদ্রোহ বাস্তবে সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে। বিচার প্রক্রিয়াকে অসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করলাম।সব পক্ষের কথা ভালভাবে শোনার ধৈর্যই রাখলাম না। এজলাসে বসার আগেই অর্ডার মোটামুটি ঠিক করে নিতাম।বলের চরিত্র না বুঝেই ছক্কা হাঁকানোর জন্য ব্যাট চালানোর মতো আর কি! বিচারপতির আসন থেকে অনেক ঝাঁঝালো কথা বললাম। পর্যবেক্ষণের নামে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করলাম। সেসব সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশিত হল।সবাই আমার নাম জেনে গেল।আমি তখন 'আদালত (বিশ্ব) ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা'। উকিল হিসেবে কোনো খ্যাতি ছিল না কিন্তু বিচারপতি হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা এনজয় করলাম। প্রথা ভাঙতে শুরু করলাম। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিলাম।বিতর্ক সৃষ্টি হল।জানতাম হবে।কিন্তু প্রথা না ভাঙলে প্রতিষ্ঠানের থেকে বড় হব কীকরে! সুতরাং, প্রথা ভাঙা ও পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব রইল না। বরং আমার 'প্লেয়িং টু দ্য গ্যালারি' চলতেই থাকলো। মাঠে ঘাটে বক্তৃতা ও সাংবাদিক বৈঠক বেড়ে গেল। 'পাবলিক' হয়ে গেলাম।সরকার বিরোধীরা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল।শাসকদল অবশ্য আমাকে গালমন্দ করতে ছাড়লো না। আমি যেমন সরকার ও শাসকদল সম্পর্কে যা খুশি তাই বলছিলাম তারাও আমাকে সেভাবেই 'পেড ব্যাক' করছিল।তারা চ্যালেঞ্জ করল, আমি যেন আদালত ছেড়ে রাজনীতির মাঠে তাদের সঙ্গে পাঙ্গা নিই। আমি স্বভাবগত ভাবে সাহসী। রিস্ক নিতে ভয় পাই না। এদিকে বিচারপতির পদ থেকে এ বছরই (২০২৪) আগস্ট মাসে আমার অবসর নেওয়ার কথা।আবার নিয়োগ দুর্নীতির মামলাগুলোও সব এক এক করে আমার বেঞ্চ থেকে সরে গেছে। মন্ত্রিসভার 'নাম্বার টু' পার্থ চ্যাটার্জিকে পাকড়াও করা গেলেও 'মাথা' পর্যন্ত পৌঁছানো যায়নি। 'ধেড়ে ইঁদুর' ধরা পড়েনি। 'ঢাকি সমেত বিসর্জন' হয়নি। কিন্তু এজলাসে বসে সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে অথবা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার হেস্তনেস্ত করার ব্যাপারে আমার হাতে আর কোনো ক্ষমতাও রইলো না।কাজেই একটা ব্যর্থতা বোধ আমাকে দংশন করছিল। বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনে উৎসাহ কমে যাচ্ছিল।এদিকে যেকোনো দিন ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে। নির্বাচন রাজনীতিতে জয়েন করার ভাল মরসুম। সব মিলিয়ে বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে পলিটিক্সে নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে।শুরু হল নতুন ইনিংস।

বামপন্থীদের সাথে আমার বরাবর একটা সুন্দর বোঝাপড়া ছিল।আমি বামপন্থী পরিবারের ছেলে।আমার বাবা সিপিএম করতেন। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় বিচারপতি হিসেবে আমি বামপন্থী আইনজীবীদের বক্তব্যকেই বেশি মান্যতা দিতাম। বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সহ একাধিক বামপন্থী আইনজীবীর কাছে কাজ শেখার কথা আমি একাধিকবার প্রকাশ্যে বলেছি। আমাকে নিয়ে চর্চা শুরু হবার পর আমি বামপন্থীদের সভায় বক্তৃতা করেছি। বইমেলায় ওদের স্টল থেকে বই কিনেছি। শাসকদল যখন আমার সমালোচনা করেছে বামপন্থীরা তখন আমাকে সমর্থন করেছে। কাজেই সবাই আমাকে বামপন্থী হিসেবেই জানত। স্বাভাবিকভাবেই, কখনও রাজনীতি করলে হয় নতুন দল গঠন করব নয়তো সিপিএমে জয়েন করব, এরকম একটা ধারণা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমাকে এই পারসেপশানের বাইরে গিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হল। আমি দেখলাম, রাজনীতিতে আমার প্রাথমিক লক্ষ্য দুটো।এক, নিজের জন্য একটা জায়গা তৈরি করা।দুই, তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা।আমি প্রথমেই নিশ্চিত হলাম যে, নতুন দল গঠন করা আমার সাধ্য নয়। এর জন্য যে অর্থ, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জনসংযোগ দরকার তা আমার নেই। এবার আসে কোনো একটা দলে যোগদান করার প্রশ্ন। সিপিএমে যাওয়া যেত। কিন্তু তাদের তো এখন খুব খারাপ অবস্থা।রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় আইনসভাতেই তাদের সদস্য সংখ্যা শূন্য। এই লোকসভা নির্বাচনেও তাদের কোনো 'সিউর সিট' নেই। বাষট্টি বছর বয়সে রাজনীতিতে এসে সিপিএমের বড় নেতা হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং, সিপিএম বাতিল। কিন্তু ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণের সম্ভাবনা নেই বলে সিপিএমে যোগদান করলাম না, একথা তো আর মুখ ফুটে বলা যায় না। তাই ওই দলে যোগদান না করার কারণ দেখালাম, ওরা ধর্ম মানে না, নাস্তিক। কিন্তু আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, ধর্ম পালন করি। অতএব, সিপিএমের সঙ্গে আমার গোড়াতেই অমিল। এমন 'মৌলিক' পার্থক্য নিয়ে তো কোনো দলে যাওয়া যায় না! দেখলাম, পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থাও তথৈবচ। তাদের সাংগঠনিক অবস্থাও খুব খারাপ।ওই দল আমাকে সাংসদ নির্বাচিত করতে পারবে না। কিন্তু বামপন্থীদের এই বৃহত্তর জোটসঙ্গী সম্পর্কে তো নাস্তিকতার অভিযোগ তোলা যায় না। তাই তাদের দলে যোগ না দেওয়ার কারণ দেখালাম, তারা গান্ধী পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি দল। আমার মতো স্বাধীনচেতা মানুষের কোনো পারিবারিক পার্টিতে যোগদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং, আমার জন্য বেস্ট অপশন বিজেপি। এই দল থেকে আমার অনেক কিছু পাওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।এখনই আমার সাংসদ হওয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে

তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্য পূরণ হতে পারে বিজেপি'তে যোগদান করলে। কিন্তু বিজেপি যে সাম্প্রদায়িক দল! করাপশনের বিরুদ্ধে লড়ে নামডাক করে কমিউনাল দলে যোগদানকে গ্রহণযোগ্য করা যায় না। তাই 'রায়' দিয়ে দিলাম, বিজেপি কোনো সাম্প্রদায়িক দল নয় আর বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক বলাটা বামপন্থীদের বাজে প্রচার। কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্নেও রাজ্যে টিএমসি চোর হলে জাতীয় স্তরে বিজেপি ডাকাত।অনেকেই টাটকা উদাহরণ হিসেবে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে বিজেপির কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা বলল। আমি মানলাম না। বললাম, বৈধভাবে নেওয়া হয়েছে। অনেকেই নারদাকাণ্ডে শুভেন্দু অধিকারীর যুক্ত থাকার কথা বলল। আমি আমার রাজনৈতিক মেন্টরকে সৎ প্রমাণ করার জন্য বললাম, নারদাকাণ্ড একটা সাজানো ঘটনা। তাছাড়া কী প্রমাণ আছে যে, ওর নেওয়া প্যাকেটের মধ্যে টাকাই ছিল! আমার মুখে এমন কাঁচা যুক্তি শুনে অনেকেই লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি! আমাকে তো তমলুকে ওর ভরসাতেই লড়তে হচ্ছে। ওদের পরিবারের একটা সিটে আমাকে প্রার্থী করেছে। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা ব্যাপার আছে!

আমি উত্তরবঙ্গের একটা সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এক মঞ্চে ছিলাম।আলাপ হল। হাতে হাত লাগানোর সুযোগ পেলাম।সবাই প্রধানমন্ত্রীর ৫৬ ইঞ্চি ছাতির কথা বলে। আমি দেখলাম তাঁর কব্জিও অনেক মোটা। জুতা পরেছিলেন বলে পায়ের আঙ্গুলগুলোর সাইজ বুঝতে পারিনি।

বিজেপির প্রচারক অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী সিনেমার সংলাপের অনুকরণে জনসভায় বিভিন্ন সাপের কথা বলেন। আমিও নিজেকে বিষাক্ত চন্দ্র বোড়ার সাথে তুলনা করেছি।

তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ ব্যানার্জি আমার বউ কেন আমার সঙ্গে থাকে না, এমন একটা প্রশ্ন তোলেন। আমি একজন বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক।কল্যাণের 'অশ্লীল' প্রশ্নের উত্তর দিইনি। পাল্টা জানতে চেয়েছি, ওর মেয়ে ও জামাইয়ের কেন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে!

আমাকে এক সাংবাদিক গান্ধী ও গডসের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলেন। আমি বললাম, ভেবে দেখতে হবে। এতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। দেখুন, গান্ধীজিকে হত্যা করার পেছনে গডসের কী যুক্তি ছিল সেসব না জেনে গডসেকে খারাপ বলা যায় না! কাজেই আমি গান্ধী ও গডসের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে পারব না। মনে রাখবেন, আমি বিজেপির প্রার্থী।বিজেপি আর এস এসের রাজনৈতিক শাখা। গান্ধীজিকে হত্যা করার দায়ে আর এস এসকে কিছুদিনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ঘাতক গডসে ছিল ওই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। একইভাবে আরেকজন সাংবাদিক মার্ক্স ও গোলওয়ালকরের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য বলেন। আমি এখানেও আমার অপারগতার কথা জানাই। আমি বললাম, মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে অল্পস্বল্প জানলেও গোলওয়ালকর পড়ে ওঠা হয়নি। আমি অবশ্য ভালোভাবেই জানি যে, দুনিয়ার মেহনতি ও মুক্তিকামী মানুষকে কার্ল হাইনরিখ মার্ক্সের মতবাদ যেরকম প্রভাবিত করে ভারতে হিন্দু ও অহিন্দুদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা হিন্দুত্ববাদীরা সে রকমই প্রভাবিত হয়।

আমি বিজেপি'তে যোগদান করে তৃণমূল কংগ্রেসের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' তথা 'ভাইপো' অভিষেক ব্যানার্জিকে রেকগনাইজ করতেই অস্বীকার করি। আমি জানি, মধ্য তিরিশের এই ছেলেটার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দৌড় বেশি না হলেও বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে কথা বলায় সে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ। দলে ও প্রশাসনে প্রভাব রয়েছে ইডি-সিবিআই লাগিয়েও দিদি-মোদির সেটিংয়ের কারণে ওকে শ্রীঘরে ঢোকানো যায়নি।টিএমসি'তে ওর দাপট সহ্য করতে না পেরেই শুভেন্দু দল ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ও আমারও টার্গেট। তবে বাহ্যিকভাবে ওকে পাত্তা না দেওয়ার ভান করি।তাই মাথার মধ্যে থাকলেও মুখে ওর নামটা সাধারণত আনি না। পরিবর্তে ভাইপো ছাড়াও বলি তালপাতার সেপাই, খোকাবাবু, দু দিনের একটা ছোঁড়া, ডেপো ছোকরা ইত্যাদি।

জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে 'কুকথা' বলায় নির্বাচন কমিশন আমাকে শাস্তি দিয়েছে।আমি ২৪ ঘন্টা প্রচারে সশরীরে অংশ নিতে পারিনি। আমি অবশ্য কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছি। বিচারপতি ছিলাম। এখন বিচারপ্রার্থী হয়েছি।

বিচারপতির আসনে বসে মেজাজ হারিয়ে ধমক দেওয়া, রূঢ় ব্যবহার করা, আলটপকা মন্তব্য করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। 'মাই লর্ড' ছিলাম। যা খুশি বলেছি। পাল্টা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়নি। রাজনীতিতে এসে প্রথম দিকে আমাকে 'ভগবান' বলা সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিয়েছি। তারা আমার বক্তব্যের সপ্রশংস প্রচার করেছে। কিন্তু প্রার্থী হওয়ার পর থেকে আর একপেশে প্রচার পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিছু তীর্যক প্রশ্নও শুনতে হচ্ছে।এক্ষেত্রে মেজাজ ধরে রাখতে পারছি না। কখনও অপছন্দের চ্যানেলের বুম দেখেই বলছি, কথা বলবো না।কখনও রিপোর্টারকে বলছি, প্রশ্ন করতে

শিখতে হয়।কখনও প্রখ্যাত সাংবাদিককে একাধিক আপত্তিকর কথা বলে সংযোগ ছিন্ন করে লাইভ টেলিকাস্ট থেকে সরে যাচ্ছি।

আমাকে রাজনীতিতে যারা আলাদা চোখে দেখতে চেয়েছিল তারা নিশ্চয়ই হতাশ হচ্ছে।আরও হবে।কিছু করার নেই। যাদের সঙ্গে আছি তাদের কাছাকাছি আসতে হলেও আমাকে নিচে নামতে হবে আবার যাদের প্ররোচনায় রাজনীতিতে এসেছি তাদের বিরুদ্ধে লড়তেও আমার অবনমন দরকার।সুতরাং, আমার পক্ষে আলাদা কিছু হওয়া সম্ভব নয়। বাঘা তেঁতুল ছাড়া বুনো ওল পাতে নেওয়া যায় না। টিট ফর ট্যাট। কেউ ইট ছুঁড়লে আমি পাটকেল ছুঁড়ছি। কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে আমি মানিয়ে নিয়েছি। আগেই বলেছি, আমি ভগবান থেকে শয়তান হয়েছি। বিস্মৃত হয়েছি বঙ্কিম-বচন, ''তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?''

বাংলার লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের গতিপ্রকৃতি

শুভ মিত্র

এবারের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু (পড়ুন মুসলমান সম্প্রদায়) দের সমর্থন কোথায় কোন দিকে যাবে তা দেখার জন্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল ও প্রায় সব দল গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর এই বিষয়ে আলোচনা করার মতন কিছু তথ্য জানা গিয়েছে । পরে হয়তো আরও তথ্য পাওয়া যাবে। সংখ্যালঘু মানুষদের ভোটদান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি ছিল তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি স্লোগান দিয়েছিলেন 'আব কী বার ৪০০ পার।' তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানকে পরিবর্তন করা। সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী, শ্রমিক, কৃষক অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকে পর্যুদস্ত করা। প্রান্তিক মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ফলে প্রবল ভীতির সঞ্চার হয়।

২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগেও বিজেপি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যে নাগরিক সংশোধনী আইন প্রণয়ন (CAA) করে নাগরিক পঞ্জিকরণের (NRC) সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন তারা ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩ কোটি অনুপ্রবেশকারীকে (পড়ুন মুসলমান) বিতারণ করবেন। এর ফলে ভিতসন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বড় অংশ রাজ্যের শাসকদল যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস, নিরাপত্তার জন্য তাদের পিছনে সমবেত হয়। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই কংগ্রেস ও বামপন্থীদের সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রভাব কমতে থাকে। যদিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কংগ্রেস বা বামদের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ ছিলনা। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বাম ও কংগ্রেস দলের মধ্যে কোনও জোট হয় নি। ফলে দু দলেরই শক্তি হ্রাস পায়। সিপিআই(এম) তাদের ২০১৪ সালে জেতা দুটি আসনেই হেরে যায়। রায়গঞ্জে মহম্মদ সেলিম ও মুর্শিদাবাদে বদরুদ্দোজা খান। কংগ্রেস ২০১৪ সালে তাদের জেতা ৪ টি আসনের মধ্যে ২ টিতে হেরে যায়। মালদহ (উত্তর) এ মৌসম বেনজির নুর ও জঙ্গিপুরে অভিজিৎ মুখার্জী। কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীদ্বয় ছিলেন মালদহ দক্ষিণে ডালু বাবু ও বহরমপুরে অধীর চৌধুরী।

২০১৯ এ বাম ও কংগ্রেসের অনৈক্য, সংখ্যালঘুদের মধ্যে NRC ভীতি থেকে তৃণমূলের প্রভাব বৃদ্ধি ফলত ভোট ভাগ এবং রায়গঞ্জ ও মালদহ (উত্তর) লোকসভা আসন দুটিতে বিজেপির প্রভাব বৃদ্ধির কারণে ওই দল জয়লাভ করে।

এই ২০২৪ এও মালদহ (উত্তর) লোকসভা আসনের অন্তর্গত আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর, গাজোল ও তপশিলি জাতি অধ্যুষিত ওল্ড মালদহ বিধানসভা ক্ষেত্রগুলিতে বিজেপি ব্যাপক ভাবে Lead পায়। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চাঁচল , রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালতিপুর বিধানসভা ক্ষেত্রে কংগ্রেস lead পায়। কোনও বিধানসভা ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস lead না থাকলেও এই দল দ্বিতীয় হয়।এই লোকসভা আসনে বিজেপির আদিবাসী প্রার্থী খগেন মুর্মু আবারও জয়লাভ করেন। এবার আবারও রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে বিজেপি জয়লাভ করেছে। রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের করণদীঘি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ এই চারটি হিন্দু প্রধান বিধানসভা ক্ষেত্রে বিজেপি বিপুল ভোটে লিড করে। কংগ্রেস এগিয়ে ছিল চাঁচল বিধানসভা ক্ষেত্রে। গোয়ালপোখোর ও ইসলামপুর বিধানসভা ক্ষেত্রে দুটিতে এগিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

দিনাজপুর,মালদহ,মুর্শিদাবাদ জেলার যেখানে ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ অধিকসংখায় বসবাস করেন তারা কংগ্রেস বাম জোটকেও যথেষ্ট সমর্থন করেছেন। এই ভোট ভাগ হওয়ার কারনে হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি জয়ী হয়েছে রায়গঞ্জ ও মালদহ উত্তরে। এই দুই জেলায় ইসলাম ধর্মীয় ভোটার রয়েছেন যথাক্রমে ৪৫ % ও ৪৬ %।

২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে অধিকাংশ সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের পক্ষে চলে যায়। এবারের লোকসভা নির্বাচনে আবার সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হয় কংগ্রেস-বাম জোট ও তৃণমূলের মধ্যে। তারা পায় ১৯.২৪% ও ৩৬% ভোট। অন্যদিকে মূলত হিন্দু ভোটের বড় অংশ বিজেপি পায়,তা ৪১% এবং জয়ী হয়।

২০২১ এর বিধানসভা ভোটে মালদা (উত্তরে) তৃণমূলের পক্ষে সংখ্যালঘু ভোট পড়ার ফলে তারা চারটি কেন্দ্রে জয়ী হয়। বাকি তিনটিতে জয়ী হয় বিজেপি। আবার ২০২৩ এর পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস ও বামেদের যৌথ ভোট বিজেপির চেয়ে বেশী ছিল। কারণ বামেদের পক্ষে হিন্দু ভোট ভালই পড়েছিল যা ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে আবার বিজেপির পক্ষে ফিরে যায়। বিজেপি,তৃণমূল ও কংগ্রেস বাম যৌথ প্রার্থী পায় যথাক্রমে ৩৭.১৮%,৩১.৭% ও ২৭.১৩%।

মালদহ (দক্ষিণ) লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯ সালে সংখ্যালঘু ভোটের বেশীর ভাগটাই পায় কংগ্রেস। সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাংলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী শতাংশ (৮৯.৩%) ইসলাম ধর্মের মানুষ বাস করেন। ২০১৯ সালে এখানে কংগ্রেস বিশ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকলেও ২০২১ এর বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয় ও তৃণমূল জয়ী হয় ১.৩ লক্ষ ভোটে। বিশ্রীভাবে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী এবারে ২০২৪ এ এই বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে ছিলেন ৮৩৬২৯ ভোটে ও পরিশেষে জয়ী হলেন১.২৮ লক্ষ ভোটে। এই লোকসভা কেন্দ্রের মোথাবাড়ী, সুজাপুর, ফরাককা ও সামসেরগঞ্জ বিধানসভা ক্ষেত্র চারটিতে কংগ্রেস বিপুল ভোটে লিড করে। শেষ দুটি ক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিজেপি লিড করে মানিকচক, ইংলিশবাজার ও বৈষ্ণবনগর বিধানসভায়। তৃণমূল কোথাও লিড পায় নি। বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেস জয়লাভ করে। তৃতীয় হয় তৃণমূল কংগ্রেস।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের জনসংখ্যা বিন্যাস অনুযায়ী জানা যায় এখানে মুসলীম জনসংখ্যা কিছুটা বেশী হিন্দুর তুলনায়। তাদের সমর্থন এবারে বেশীরভাগটাই পেয়েছে তৃণমূল , তাই তারা জয়ী হয়েছে গত পাঁচবারের সাংসদ কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীকে পরাজিত করে। হিন্দু ভোট ভাগ হয়েছে মূলত কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে। গত ২০১৯ এর নির্বাচনে বড়ঞ্চা , বহরমপুর ও কাঁদি বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী হতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এবারে বিজেপি এই সমর্থনে ভাগ বসানোর ফলে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়। কংগ্রেস শুধু বহরমপুর বিধানসভায় এগিয়ে ছিল। বিজেপি এগিয়ে ছিল বড়োঞ্চা বিধানসভায়। আর তৃণমূল এগিয়ে ছিল কাঁদি, ভরতপুর, রেজিনগর , নওদা ও বেলডাঙ্গা বিধান সভায়।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের শক্তিকে অধীর চৌধুরী ছোট করে দেখেছিলেন। রায়গঞ্জ ,বহরমপুরসহ মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কোনও সভা করেন নি। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা জানুয়ারি মাসে মালদা ও মুরশিদাবাদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিপুল সাড়া জাগায়। সমসেরগঞ্জে বিড়ি শ্রমিক মহিলাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু নির্বাচনের সময় এই তিন জেলায় রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী , দুজনের কেউ আসেন নি। অথচ মোদী, শাহ, নাড্ডা এরা সবাই এসেছেন। বারবার এসেছেন মমতা ব্যানার্জী। মালদায় মল্লিকার্যুন খারগে একবার এসেছিলেন। ওই জেলা থেকে কংগ্রেসের একমাত্র এম.পি নির্বাচিত হয়েছেন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়ার ফলে এই তিন জেলায় কংগ্রেস – বাম জোট প্রত্যাশিত ফল লাভ করতে পারে নি। এবার নির্বাচনী প্রচারে যে ভাষায় প্রধানমন্ত্রী মোদী কংগ্রেসকে সামনে রেখে ইসলাম ধর্মের মানুষদের আক্রমণ করতে থাকেন তা যে কোনও ভদ্র সভ্য সমাজের পরিপন্থী। সমস্ত ধর্মের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ কংগ্রেসের সমর্থনে সমবেত হতে থাকে।এই রাজনৈতিক ন্যারেটিভটি এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্ব তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

জঙ্গীপুর ও মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলীম। এই কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস – বাম জোটের সঙ্গে তৃণমূলের মূল লড়াই। এখানে তুলনায় মুসলীম ভোট বেশী পাওয়ার কারণে তৃণমূল ১.১৬ লক্ষ ও ১.৬৪ লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছে এবার। মুর্শিদাবাদের রাণীনগর বিধানসভা ক্ষেত্রে সিপিআই(এম) প্রার্থী লিড করেন। জঙ্গিপুর লোকসভার লালগোলা বিধানসভা ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রার্থী লিড করেন।

কিন্তু এই ধরণের মুসলীম ভোট ভাগ হয় নি দক্ষিনবঙ্গে। বসিরহাট,ডায়মন্ড হারবার, কৃষ্ণনগর, জয়নগর, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে মুসলীম ভোটের বৃহদাংশ পেয়েছে তৃণমূল। ফলে তাদের জয় এসেছে সহজে। আবার কলকাতার পার্শবর্তী কেন্দ্র বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর ও মথুরাপুরে আইএসএফ তৃতীয় স্থান লাভ করে তৃণমূল ও বিজেপির ঠিক পরেই। বাম প্রার্থীরা এই কেন্দ্রগুলিতে চতুর্থস্থানে রয়েছে।

বীরভূমের হাসান, নলহাটি, মুরারাই এর মত মুসলীম প্রধান এলাকায় কংগ্রেস ভাল সমর্থন পেলেও ভাঙর, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাঁখা, কুলপী, ক্যানিং ইস্টে বাম প্রার্থীরা সেভাবে দাগ কাটতে ব্যর্থ। এসব এলাকায় আইএসএফ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই নতুন দলটি হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল এইসব কেন্দ্রে। আবার মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলী বা নদীয়াতে তারা কোন ছাপই কাটতে পারে নি। তারা যে সাড়ে ছয় লাখ ভোট পেয়েছে তা কলকাতার উপকণ্ঠের কেন্দ্রগুলিতে।